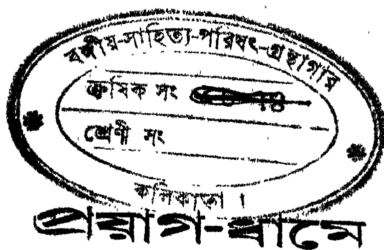
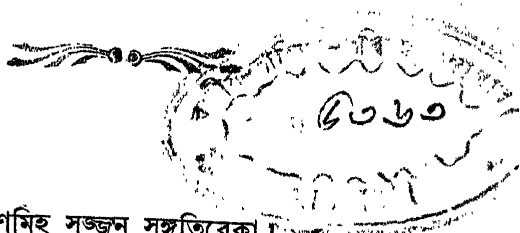


প্রয়াগ-ধামে

কুম্ভ-মেলা।



"ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতিরেকা।
ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা॥"

শ্রীমনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা প্রণীত।

তৃতীয় সংস্করণ।

প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড্ সন্স্
২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

কলিকাতা, ৬০ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট্,
বণিক প্রেস্ হইতে
শ্রীশিবপদ ঘোষ বর্ম্মণ দ্বারা মুদ্রিত।

নিবেদন।

পূর্ব্বে বিশেষ সঙ্কল্প ছিলনা, একদিন প্রাণের টানে হঠাৎ "কুম্ভ-মেলায়" ছুটিয়া গেলাম। মেলার বিষয় কিছু লিখিব, এমন কথা তখন মনেও হয় নাই, মনের ভাব সেরূপ থাকিলে মেলা দেখাই বৃথা হইয়া যাইত। কলিকাতায় ফিরিয়া বন্ধু বান্ধবদের নিকট মেলার কথা বলিতে যাইয়া লিখিতে ইচ্ছা হইল, অনেকে লিখিতে অনুরোধও করিলেন। গত চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের পাঁচ সংখ্যা "সঞ্জীবনী" পত্রিকায় "প্রয়াগ-ধামে কুম্ভ-মেলা" নাম দিয়া পাঁচখানা পত্র প্রকাশিত করিলাম। তখন অনেকে এই বিবরণ গ্রন্থবদ্ধ করিতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। "সঞ্জীবনী"তে প্রকাশিত সেই পাঁচখানি পত্রকে অন্তর্গত করিয়া "প্রয়াগধামে কুম্ভ-মেলা" ক্ষুদ্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল।

এই গ্রন্থ কুম্ভ-মেলার প্রকৃত ইতিহাস নহে। ইতিহাস লিখিতে হইলে, অনেক বিষয়ের বর্ণনা করিতে হইত, ইহাতে সে সমস্ত নাই। অনেকে বলিয়াছেন, "কেবল গুণের কথাই বলা হইয়াছে, দোষের কথা কি কিছুই নাই? প্রকৃত সমালোচনা করিতে হইলে দোষ গুণ উভয়ই প্রকাশ করা উচিত"। আমার নিবেদন, আমি সমালোচনার জন্য কিছু লিখি নাই। বিশেষতঃ সেই মেলা স্থলে, স্থানমাহাত্ম্যে, সাধুসঙ্গে আমার ন্যায় হীন-ব্যক্তিরও দোষ-দর্শন প্রবৃত্তি জাগরিত ছিল না।

বড়ই ভয়ে ভয়ে লিখিয়াছি, সংসারের ধূলামাখা হাতে স্বর্গের ফুল ধরিতে কাহার না ভয় হয়? ভরসা এই যে, ভক্ত-চরিত্র-মহিমা আমার ধৃষ্টতাকে অতিক্রম করিয়াও জীবের কল্যাণ সাধন করিতে পারে।

২০শে আষাঢ়, সন ১৩০১ সাল। | নিবেদক গ্রন্থকার।

তৃতীয় সংস্করণে নিবেদন।

বাংলা ১৩০১ সালের আষাঢ় মাসে এই পুস্তক প্রথম ২ সহস্র প্রকাশিত হয়। অতি অল্প কালের মধ্যে প্রায় এক সহস্র পুস্তক বলিতে গেলে ঘর হইতে বিক্রীত হইয়া গিয়াছিল। ইহা বাঙ্গালী পাঠকদিগের সাধুভক্তির যথেষ্ট পরিচায়ক।

১ম সংস্করণের পুস্তকগুলি নিঃশেষিত হইলে বহু বৎসর মধ্যে ইহার পুনঃ সংস্করণ হয় নাই। ইংরাজী ১৯০৭ সালে দ্বিতীয় সংস্করণে দুই হাজার পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছিল, কিন্তু কয়েক বৎসর কাল হইতে বাজারে এই পুস্তক পাওয়া যাইতেছিলনা, তাই তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

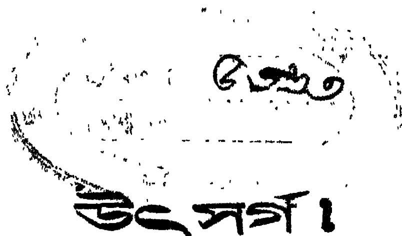
"কুম্ভ-মেলা" পাঠ করিয়া কোন এক মহাত্মা বলিয়াছিলেন যে, "ইহা সূত্র স্বরূপ হইল, কালে ইহার বিস্তৃতি আবশ্যক।" অনেক সম্ভ্রান্ত ও ভক্ত পাঠক বলিয়াছেন যে, "এই সুমিষ্ট খাদ্যটীর পরিমাণ বড়ই অল্প হইয়াছে" এই সকল কারণে এবারে এই পুস্তকের লিখিত বিষয় প্রায় চারিগুণ বর্দ্ধিত হইল। গ্রন্থোক্ত কয়েকজন সাধুর জীবন-কথা বিশদরূপে বর্ণন করায় গ্রন্থের আকার এতটা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পুরাতন পুস্তকে যাহা ছিল তাহা পাইকা অক্ষরে এবং নূতন অংশ স্মল-পাইকা অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে সুতরাং পাঠকগণ অনায়াসে পুরাতন ও নূতনের পার্থক্য বুঝিতে পারিবেন।

এই সঙ্গে ইহাও বক্তব্য যে, এইবারে স্বদেশী উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে, গ্রন্থোক্ত চারিজন মহাপুরুষের প্রতিরূপ দেওয়া গিয়াছে এবং উৎকৃষ্ট বাইণ্ডিং করা হইয়াছে সুতরাং সেই হিসাবে মূল্য অসঙ্গত হয় নাই।

প্রবীণ সাহিত্যিক ৺চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই পুস্তকের একটী ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত করিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছিলেন। স্বনাম-ধন্য শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় তাঁহার বিলাত বাসের সময় স্বপ্রনোদিত হইয়া ইহার ইংরাজী অনুবাদ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন কিন্তু নানা প্রকারের ঘটনা বশতঃ তাহা হইয়া উঠে নাই। যদি কেহ এই পুস্তকের ভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করিয়া সাধু-মাহাত্ম্য প্রচার করেন, তজ্জন্য সুধু যে গ্রন্থকারের আপত্তি থাকিবেনা তাহা নহে, তিনি সে জন্য অনুবাদকের নিকট আপ্যায়িত থাকিবেন।

তাং ২০শে আশ্বিন,
বাং ১৩২২ সাল। } প্রকাশক—



উৎসর্গ।

সাধুনিষ্ঠ পরলোকগত

শ্রীমান্ সত্যকুমার গুহ ঠাকুরতা

ভগবদ্ভক্তেষু।

প্রিয়তম,

সংসারের সম্বন্ধে তুমি আমার ভ্রাতুষ্পুত্র এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে গুরু ভাই ছিলে। প্রথম সম্পর্ক লুপ্ত হইয়াছে কিন্তু দ্বিতীয় সম্বন্ধ অনন্তকাল থাকিবে। তুমি আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছ, মৃত্যু আমাদিগের নিকট হইতে তোমাকে পৃথক করিয়াছে কিন্তু তোমার লজ্জামাখা মধুর-প্রেম, অকপট দীনহীন-ভাব, এক-স্রোত ধর্ম্মানুরাগ, প্রাণগত সাধুভক্তি, আমাদের নিকট তোমাকে সজীব করিয়া রাখিয়াছে।

সংসারের আত্মীয়েরা তোমাকে চিনিতে পারে নাই; অপার্থিব ধন তুমি, অনাদরে গড়াগড়ি গিয়াছ। আমরাই কি প্রাণ ভরিয়া তোমাকে আদর করিতে পারিয়াছি? এত শীঘ্র যে তুমি আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইবে তাহা আমরা ভাবি নাই। তুমিত চলিয়া গিয়াছ কিন্তু আমাদিগকে নির্জ্জনে সজল-নয়নে তোমার নাম স্মরণ করিতে হয়।

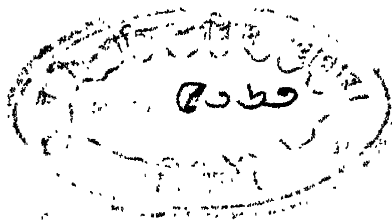
তোমার ন্যায় সৌভাগ্যশালী কে? প্রয়াগ-ধামে কুম্ভ-মেলায় একমাস কাল সাধুসঙ্গে থাকিয়া, তথা হইতে নবদ্বীপ-ধামে প্রেমাবতার মহাপ্রভুর জন্মোৎসবে যোগদান করিয়া, শ্রীঅদ্বৈত পাট শান্তিপুরে গুরু এবং গুরু ভাইদিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া হরিনাম শুনিতে শুনিতে তুমি শান্তি-

ধামে গমন করিয়াছ। একটী ধর্ম্ম-স্রোতের মধ্য দিয়া তুমি চলিয়া গিয়াছ, এত সৌভাগ্য কাহার হয়? তোমার ন্যায় পুণ্যবান্ কে? মৃত্যু শয্যায় শয়ন করিয়া এমন করিয়া কে বলিতে পারে, "মৃত্যুর জন্য আমার কোন ভয় নাই, রোগ-যন্ত্রণা ভিন্ন আমার আর কোন যন্ত্রণা নাই, আমি শান্তির সহিত যাইতেছি।" পুণ্যবান্, তোমারই পুণ্যে তোমার পতিব্রতা স্বাধ্বী-স্ত্রী সান্ত্বনালাভ করিবেন এবং আমরাও জুড়াইব।

প্রিয়তম, আমাদের কুম্ভ-মেলার স্মৃতির সহিত তোমার স্মৃতি জড়াইয়া রহিয়াছে, বিশেষতঃ সাধুদিগের মর্য্যাদা তোমার অধিক কেই বা বুঝিবে? তাই সাধু-পদ-রজ-মাখা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি তোমারই পবিত্র-নামে উৎসর্গ করিলাম।

২০শে আষাঢ়,
১৩০১ সাল।

প্রেমানুগত
শ্রীমনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা।



প্রয়াগ-ধামে

কুম্ভ-মেলা।

(বাং ১৩০০ সন)

আরম্ভ।

গত মাঘ মাসে (১৩০০ সালে) প্রয়াগধামে ত্রিবেণীক্ষেত্রে কুম্ভমেলার মহাধিবেশন সন্দর্শন করিয়া প্রাণে যে অভূতপূর্ব্ব বিচিত্র ভাবের আবির্ভাব হইয়াছিল, ইচ্ছা হয় সকলের নিকট তাহা প্রকাশ করিয়া সুখী হই।

প্রথমেই মনে হয় স্থান-মাহাত্ম্য। ভারতের শ্যামলবক্ষ-প্রবাহিতা ধনধান্যের নিদানভূতা বিমলসলিলা গঙ্গাযমুনা, এই প্রয়াগধামে একত্রে মিলিত হইয়াছে। প্রাচীনকালে সরস্বতী নামে আর একটী নদী গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমে মিলিয়া এই স্থানকে 'ত্রিবেণী' নামে অভিহিত করিয়াছিল। এই তিনটী স্রোতস্বতীর সঙ্গে ভারতের আদ্যন্ত ইতিহাস, বেদ বেদাঙ্গ, স্মৃতি-দর্শন, কাব্য-পুরাণ, গণিতবিজ্ঞান, শিল্প বাণিজ্য, যাগ-যজ্ঞ, ধ্যান-ধারণা, শৌর্য্য-বীর্য্য, এবং সম্মান ও স্বাধীনতা, সমস্তের স্মৃতিই মিশ্রিত রহিয়াছে। আবার এই ত্রিধারার ন্যায় তিনটী জাতির স্মৃতিস্রোতও ইহার সহিত প্রবাহিত হইতেছে। ত্রিবেণী-সঙ্গমের ঠিক বক্ষোপরি এলাহাবাদের দুর্ভেদ্য দুর্গ, এই দুর্গ ইস্‌লাম রাজ্যের বিগত-গৌরব ঘোষণা করিতেছে; দুর্গের শিরোদেশে বৃটিশ-কেতন সগর্ব্বে উড়িতেছে, দুর্গের অভ্যন্তরে হিন্দুর প্রাচীন-স্মৃতি লইয়া অক্ষয়-বট দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

এই স্থানে সেই ভরদ্বাজাশ্রম, যে আশ্রমে বনগমনকালে শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণ ও জানকীসহ আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রাচীনকালে এই স্থানে শমদম-দয়ানিধান পরমার্থ-তত্ত্বজ্ঞ মহর্ষি ভরদ্বাজের মুনিজন-মনোহর পবিত্র আশ্রমে প্রতিবৎসর মাঘ-মকর-সংক্রান্তিতে মুনিঋষিগণ সমবেত হইয়া ত্রিবেণী-স্নান, অক্ষয়-বট স্পর্শ এবং ভগবানের পাদপদ্মপূজা করিতেন। সেই ঋষিসমাজ পরস্পর হরিগুণগান, ধর্ম্মবিধি প্রণয়ন, ব্রহ্মনিরূপণ, তত্ত্ববিভাগ এবং জ্ঞান ও বৈরাগ্যযুক্ত ভগবদ্‌ভক্তির আলোচনা করিতেন *। এই স্থানের দশাশ্বমেধ ঘাটে প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীযুক্ত প্রভুপাদ রূপ গোস্বামী মহাশয়কে দীক্ষা ও শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। আহা! ত্রিবেণীতে উপস্থিত হইয়া প্রাণ যে কত ভাবেই বিভোর হয়, ভাবাবেশে সমস্ত হৃদয়গ্রন্থি এলাইয়া দিয়া মন যে কোথা হইতে কোথায় ছুটিয়া যায়, তাহা কি প্রকাশ করিয়া বলা যায়?

---

* ভরদ্বাজ মুনি বসহিঁ প্রয়াগা।
জিনহিঁ রামপদ অতি অনুরাগা।
তাপস শম দম দয়া নিধানা।
পরমারথ-পথ পরম সুজানা॥
মাঘ মকরগত রবি যব হোই।
তীরথ পতিহিঁ আওসব কোঁই॥
দেবদনুজ কিন্নর নর শ্রেণী।
সাদর মজ্জহি সকল ত্রিবেণী॥
পূজহিঁ মাধব-পদ-জলজাতা।
পরষি অক্ষয়-বট হরষিত গাতা॥
ভরদ্বাজ আশ্রম অতি পাবন।
পরম রম্য মুনিবর মন ভাবন॥
তঁহা হোই মুনি-ঋষয় সমাজা।
জাঁহি যে মজ্জন তীরথ রাজা।
মজ্জহিঁ প্রাত সমেত উচ্ছাহা।
কহহি পরস্পর হরিগুণ গাহা॥
ব্রহ্ম নিরূপণ ধর্ম্মবিধি বরণহিঁ তত্ত্ব বিভাগ।
কহহিঁ ভক্তি ভগবন্ত কি সংযুত জ্ঞান বিরাগ॥
য়িহি প্রকার ভরি মকর নহাহী।
মুনি সব নিজ নিজ আশ্রম জাহি॥
প্রতি সম্বৎ অস হোই আনন্দা।
মকর মজ্জ গয়োনাহি মুনি বৃন্দা॥

তুলসীদাসের রামায়ণ, বালকাণ্ড।

এই পুণ্যক্ষেত্রে, এই অনন্তকীর্ত্তির স্মৃতিমন্দিরে, গত মাঘে (১৩০০ সালে) কুম্ভমেলার পূর্ণ অধিবেশন হইয়াছিল। পাঠক, একবার মানস-চক্ষে এই ক্ষেত্র দর্শন করিয়া মেলার বিবরণ পাঠ করুন।

দক্ষিণ-বাহিনী গঙ্গা ও পূর্ব্ববাহিনী যমুনা যেখানে মিলিত হইয়াছে, সেই সমকোণ ক্ষেত্রেই প্রয়াগ-দুর্গ। দুর্গের উত্তর পার্শ্ব দিয়া এলাহাবাদ সহর হইতে প্রশস্ত রাজপথ গঙ্গায় আসিয়া মিশিয়াছে। এই রাস্তার উভয় পার্শ্বে বহুদূর ব্যাপিয়া বিপণিশ্রেণী। এই স্থান হইতেই মেলা আরম্ভ। গঙ্গার পশ্চিমপারে মেলার জন্য হাট বাজার, মেলার জন্য ডাকঘর, কল্পবাসিগণের কুটীর এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মপ্রচার-ক্ষেত্র। সরস্বতী দয়ানন্দের আর্য্যসমাজের প্রচার গৃহ বিশেষ জমকাল হইয়াছিল। ইহার অনতিদূরে শাস্ত্রার্থ-প্রচারিণী-সভা, এই সভা আর্য্য-সমাজের বিরোধী। এতদ্ব্যতীত খ্রীষ্টান মহাশয়েরা প্রচার ক্ষেত্র খুলিয়াছেন। মাঘ মাসে প্রয়াগে কল্পবাস হিন্দুশাস্ত্রমতে বিশেষ পুণ্যজনক, এজন্য প্রতি বৎসরেই এই সময় অনেক নরনারী এখানে এক মাসকাল বাস করেন, ইহাকে, কল্পবাস বলে। এ বৎসর পূর্ণ-কুম্ভমেলা হওয়ায় কল্পবাসীর সংখ্যা অসংখ্য হইয়াছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৃণ-কুটীরে কল্পবাসিগণ বাস করিতেন। এই কুটীরগুলি প্রকৃতই কুটীর, বলিতে গেলে অতি সামান্য কিঞ্চিৎ তৃণাচ্ছাদন মাত্র। বৃষ্টির ধারার কথা দূরে থাকুক উহা রজনীর শিশির-ধারা ও সম্পূর্ণরূপে নিবারণ করিতে পারে না। কল্পবাসিগণের কুটীর কত হাজার উঠিয়াছিল বলিতে পারিনা কিন্তু তাহাতে গঙ্গার তীর-ভূমি একটী বৃহৎ বন্দরের ন্যায় দৃষ্ট হইয়াছিল। অসংখ্য নরনারী দুরন্ত শীতে কত ক্লেশেই একমাসকাল রজনী-যাপন করিয়াছেন! স্নানের পূর্ব্বদিন অযুত অযুত নরনারী কোথাও আশ্রয় না পাইয়া এলাহাবাদের শীতে মাঘের হিমানীতে

সম্পূর্ণ অনাবৃত নদীতীরে সামান্য গাত্রবস্ত্র মাত্র অবলম্বন করিয়া যামিনী যাপন করিয়াছেন। ধর্ম্মনিষ্ঠা ও ধর্ম্মার্থ ক্লেশ স্বীকার দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়!

গঙ্গার পশ্চিম পারে এলাহাবাদ এবং পূর্ব্বপারে ঝুঁসি। মধ্যস্থলে গঙ্গাগর্ভে প্রকাণ্ড চড়া, দেখিতে ক্ষুদ্র একটী দ্বীপের ন্যায়। এই চড়া ও ঝুঁসির মধ্যে অনতি-বিস্তৃত একটী গঙ্গাস্রোত প্রবাহিত। এলাহাবাদ হইতে চড়ায় যাইবার জন্য বিস্তৃত নৌসেতু নির্ম্মিত হইয়াছিল। চড়া হইতে ঝুঁসি যাইতে হইলে এই পুল পার হইয়া প্রায় এক মাইল দুরবর্ত্তী দারাগঞ্জ নামক স্থানের অপর একটী সেতু পার হইয়া যাইতে হয়, ইহাতে চড়া হইতে ঝুঁসি প্রায় তিন মাইল ব্যবধানে পড়িয়া গিয়াছে। এই চড়াতেই অধিকাংশ সাধু-সন্ন্যাসীদের আসন স্থাপিত হইয়াছিল, ঝুঁসিতেও অনেক সাধু ছিলেন।

কুম্ভমেলা বিষয়টা কি, তাহা আগে বলা উচিত। ইহা সাধুদিগের একটী কঙ্গ্রেস। ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধুগণ ইহাতে একত্রিত হন, প্রত্যেক তৃতীয় বৎসরে এক এক স্থানে এই মেলার অধিবেশন হইয়া থাকে। গত কুম্ভ হরিদ্বারে হইয়াছে, আগামী তৃতীয় বৎসরে পঞ্চবটীতে এবং তৎপরে এইরূপ উজ্জয়িনীতে হইবে। ঘুরিয়া আবার ১২ বৎসর পরে প্রয়াগে হইবে। কতশত বৎসর হইতে এই মেলা চলিয়া আসিতেছে তাহার ইতিহাস নাই। ইহার কোন উদ্যোগকর্ত্তা নাই, সংবাদদাতা নাই, সভাপতি নাই, সম্পাদক নাই এবং কার্য্যনির্ব্বাহক-সভা নাই। কুম্ভমেলা সকলেরই মেলা, সকলেই স্বয়ং আহূত। এই প্রকাণ্ড চড়া এবং ঝুঁসি প্রভৃতি যে সকল স্থানে সাধুদিগের আসন ও আশ্রম স্থাপিত হইয়াছিল সে সকলস্থানের জমিদারগণ এবং মেলার জন্য উহা নিষ্কর দিয়াছেন।

কুম্ভমেলায় লোকসংখ্যা কত হইয়াছিল, অনুমান করিতে আমার কিছুমাত্র শক্তি নাই। লোকপ্রবাহ, দূর হইতে দেখিলে বিচিত্র-বসনে সুসজ্জিত ঘনসন্নিবিষ্ট চিত্র-পুত্তলিকাশ্রেণীর ন্যায় স্থির বোধ হইত। যতদূর দৃষ্টি চলে, ততদূর এই লোকারণ্য! গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া দেখিতে যে কি অপূর্ব্ব দৃশ্য হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা হয় না। শুনিতে পাই, লোকসংখ্যা অন্যূন দশ লক্ষ হইয়াছিল। এরূপ জনসমাগম পৃথিবীতে নাকি আর কোন মেলায় দেখা যায় নাই। এত জনসমাগম কিসের জন্য ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। কোন আমোদ-প্রমোদের জন্য নয়, ক্রয় বিক্রয়ের জন্য নয়, কোন প্রদর্শনীর জন্য নয়, কেবলমাত্র স্নান ও সাধুদর্শন জন্য! এরূপ উদ্দেশ্যে এরূপ জনতা অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই।

উৎসাহ, উদ্যম, অনুরাগ, নিষ্ঠা, দান, সদাব্রত, বৈরাগ্য ও বদান্যতা প্রভৃতি মেলার হাওয়ার সহিত এমনই মিশাইয়া গিয়াছিল যে, প্রতিক্ষণে মনে হইত, যেন কোন নূতন জগতে আসিয়াছি। আমাদের মতন লোকের মন ও সংসার ভুলিয়া আত্মহারা হইয়া যাইত। এই মেলা এরূপ প্রকাণ্ড কাণ্ড এবং এরূপ অপূর্ব্ব ব্যাপার যে, চিন্তা করিলে স্বপ্নকল্পিত রাজ্য বলিয়া মনে হয়। অযুত অযুত সাধুসন্ন্যাসী, কেহ কুটীরে, কেহ বস্ত্রাবাসে, কেহ ছত্রাচ্ছাদনে, কেহ বা সম্পূর্ণ অনাবৃত বসিয়া আছেন। কেহ গৈরিকধারী, কেহ কৌপিন-বহির্ব্বাসধারী, কেহ বা শুদ্ধ কৌপিনধারী। কাহারও গাত্রে যৎকিঞ্চিৎ আচ্ছাদন আছে, কেহ বা শুদ্ধ বিভূতিভূষিত-দীর্ঘ-জটাধারী। হিন্দুর মনে যত প্রকার সাধু-পরিচ্ছদের কল্পনা আছে সে সমস্তই একত্র সম্মিলিত। পুরাণে নৈমিষারণ্যের ঋষিসভার বর্ণনা পাওয়া যায়, এ দৃশ্য তাহা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। এই সাধুদলে মহা মহা পণ্ডিত আছেন, মহাধ্যানী, মহাকর্ম্মী, মহাপ্রেমিক, মহাদাতা আছেন।

একদিকে যেমন মেলার বাহ্য দৃশ্য অতি অদ্ভুত, অন্যদিকে ইহার আভ্যন্তর-দৃশ্যও অতিশয় গভীর। অযুত অযুত গৃহস্থ-নরনারী ভক্তিভাবে সাধুদিগকে প্রণাম করিতেছে, জানি না কিসের জন্য প্রণাম করিয়া বদন তুলিতে কত শত সরল-প্রাণ নরনারীর গণ্ডদেশ নয়ন-ধারায় ভাসিয়া যাইতেছে! কত কত ধনী ব্যক্তি রাশীকৃত উপহার-সামগ্রী লইয়া পাছে বা উপেক্ষিত হয়, এই ভয়ে সসঙ্কোচে সাধুদের নিকট করযোড়ে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। দানের কি আশ্চর্য্য প্রণালী, দান গৃহিত হইলে দাতা যেন কৃতার্থ হন! মেলার আভ্যন্তর বর্ণনায় প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে, একটী বিশেষ কথা না বলিলে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইবে। এই প্রকাণ্ড মেলার সুবন্দোবস্তের জন্য রাজপুরুষগণ যাহা করিয়াছেন, যেরূপ শ্রম-স্বীকার ও সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন, সেজন্য তাঁহারা ধন্যবাদের পাত্র।

অভিনিবেশ।

পাঠক, একবার মানসচক্ষে অবলোকন করুন। প্রয়াগে গঙ্গার প্রকাণ্ড চড়ায় কি এক নূতন রাজ্যের আবির্ভাব হইয়াছে। এ রাজ্যের অধিবাসী সকলই সন্ন্যাসী; বাসগৃহ-, কাহারও আকাশ, কাহারও ছত্র, কাহারও কুটীর, কদাচিৎ বা বস্ত্রাবাস; পরিচ্ছদ-, কৌপিন, বাহ্য-বাস, কম্বল ও গৈরিক বস্ত্র; অলঙ্কার-, বিভূতি, জটা, মালা ও তিলক; সম্পত্তি-, ধর্ম্মগ্রন্থ ও ধুনীর কাষ্ঠ; সম্বল-, শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং হরিনাম। এই প্রকাণ্ড সাধু-নিবাসে হাট নাই, বাজার নাই, ক্রয় নাই, বিক্রয় নাই, কোন ডাকাডাকি হাঁকাহাঁক কিছুই নাই। অন্যান্য

মেলায় আট আনা লোক হইলে ষোল আনা গোল হয় কিন্তু এ মেলায় পৌনে ষোল আনা লোকই কথা বলে না। হাজার হাজার সাধু বসিয়া আছেন, ইহাঁরা সকলেই অল্পভাষী। সাধুদর্শন করিতে দলে দলে যাঁহারা আসিতেছেন তাঁহাদের মুখেও প্রায়ই কথা নাই, হয়ত দলের মধ্যে কোন একজন কোন সাধুকে দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, অতি সংক্ষেপ-প্রত্যুত্তর পাইয়া সকলে প্রণাম করিয়া অন্য সাধু দর্শনে চলিলেন। বস্তুতঃ এত লোকের স্বাধীন-সমাগমেও যে এরূপ নিস্তব্ধতা রক্ষিত হইতে পারে, ইহা পূর্ব্বে কখন কল্পনাও করিতে পারি নাই। মেলার শৃঙ্খলা দেখিলে অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। এতগুলি বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী স্বাধীন লোক একমাসকাল একত্র গায়ে গায়ে বাস করিলে কত বিশৃঙ্খলা এবং কত বাক্‌বিতণ্ডা ও কোলাহল হইবার কথা কিন্তু এখানে সেরূপ কিছুই হয় নাই। যেমন আবহমান-কাল হইতে বিনা নিমন্ত্রণে, বিনা উদ্যোগে, এই বৃহৎ মেলা মিলিতেছে, সেইরূপ আবহমানকাল-প্রচলিত কতকগুলি বদ্ধমূল রীতিনীতি এই মহামেলার শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেছে। এস্থলে তাহার দুই একটীর উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

একটী প্রধান নীতির নাম 'আনুগত্য'। সম্পূর্ণ স্বাধীন ব্যক্তিরা যখন শ্রদ্ধার বশবর্ত্তী হইয়া কোন ব্যক্তির নিকট একান্ত আনুগত্য স্বীকার করেন, তাঁহাদের তখনকার সে অবস্থা দেখিতে প্রাণে কত আনন্দ হয়। এক এক জন মহান্তের অধীনে এক এক দল সাধু, এরূপ এক এক দলে শত শত সাধু থাকেন। এই সাধুরা সকলেই মহান্ত মহাশয়ের শিষ্য নহেন কিম্বা কোন রূপ আশ্রিত নহেন। যাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা অধিক সকলে মিলিয়া এমন এক এক ব্যক্তিকে সাময়িকরূপে আপনাদের কর্ত্তা করেন। এই নির্ব্বাচনে কোন প্রকার

বিবাদ বিসম্বাদ বা মনান্তর হয় না, কেবল মাত্র সকলের হৃদয়ের সরল-শ্রদ্ধাই এই নির্ব্বাচন কার্য্য নির্ব্বিবাদে সম্পন্ন করে। এই নির্ব্বাচিত মহান্তের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন সুশৃঙ্খলার একটী প্রধান কারণ।

আর একটী প্রধান কারণ সার্ব্বভৌমিক উদারতা। এ বস্তুটী এখানে যেরূপ দেখা গেল, পৃথিবীর আর কোথাও সেরূপ দেখিবার প্রত্যাশা নাই। সাধুদিগের মধ্যে শত শত বিভিন্ন ধর্ম্মমত, বিভিন্ন আচার আচরণ, বিভিন্ন প্রণালীর সাধন ভজন প্রথা কিন্তু পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা-প্রদর্শনের প্রণালী অতি আশ্চর্য্য! কেহ কাহারও নিন্দা করেন না, কাহারও মতের প্রতিবাদ করেন না, যাহাতে লোকের ভক্তি বিশ্বাস বৃদ্ধি পায় সেইরূপই আলাপ ও আশীর্ব্বাদ করেন। এই প্রকাণ্ড মেলায় পর-নিন্দা, পরচর্চ্চা শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। সাধুরা আলাপাদির সময় নিজের মতের ন্যায় অপরের মতের প্রতিও সমুচিত শ্রদ্ধা প্রদান করেন। ইহার একটী বিশেষ কারণ এই যে, ইঁহারা মতের প্রতি বিশেষ মনোযোগ না করিয়া আধ্যাত্মিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখেন; কাহার চরিত্র কিরূপ বিকশিত হইয়াছে, কাহার মন কিরূপ নির্ম্মল হইয়াছে, ইহাই তাঁহারা দেখেন এবং তাহাই ধরিয়া শ্রেণী গণনা করেন, কাজেই একই লক্ষ্যে সকলেরই দৃষ্টি থাকায় বাহিরের বিভিন্নতার মধ্যেও এক প্রকার অভ্যন্তরিণ একতা রহিয়াছে। এরূপ ভাব না থাকিলে একমাসকালব্যাপী বিভিন্ন মতাবলম্বী অযুত অযুত লোকের একত্র সমাবেশে পরনিন্দা, বাক্‌বিতণ্ডা ও কলহ কোলাহলে মেলা স্থানটী গরম হইয়া উঠিত, অতিরিক্ত আরও কি হইত তাহা বলা যায় না।

শৃঙ্খলার একটী বাহ্য কারণ এই যে, মেলাস্থলে হাট বাজার, ক্রয় বিক্রয় ছিল না।* এলাহাবাদের পার হইতে খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করিয়া আনিতে হইত। সাধুরা একদিনের বস্তু অন্য দিনের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখেন না,

এক বেলা আহার, প্রতিদিন খাদ্য-দ্রব্য যাহা কিছু আসে কিম্বা যাহা কিছু ক্রয় করা হয়, তাহা সেই এক বেলায়ই নিঃশেষ করা হয়, দেখিলে মনে হয় সেই হাজার হাজার লোকপরিপূর্ণচড়া ভূমি হইতে সংসারটা যেন একবারে উঠিয়া গিয়াছে। যাহা লইয়া কোলাহল, তাহার কিছুই সেখানে নাই। চড়ার অপর পারে সমুদ্র গর্জ্জনের ন্যায় লোক-কোলাহল, মনে হইত চড়াটী যেন মহাসমুদ্রের কোলে এক মহাশ্মশান, তাহাতে কেবল অসংখ্য অগ্নিকুণ্ড এবং অগণিত জটাজুটধারী শ্মশান বিহারী সদাশিব।

শৃঙ্খলার কথা ছাড়িয়া এখন সাধুদিগের আহার ও উপজীবিকার কথা বলিব। সাধুদিগের মধ্যে এমন লোক আছেন, যাঁহারা খুব ধনী মহান্ত, এমন লোক আছেন, বড় বড় ধনী ও রাজগণ যাঁহাদের করতলস্থ কিন্তু অধিকাংশ সাধুই নিঃসম্বল ও অযাচক, ইহাদের কিছুই সঞ্চিত নাই, কোথা হইতেও কিছু আসিবার সম্ভাবনা নাই, তাঁহারা ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া আকাশ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া আছেন। অনেকের কোন কোন দিন বা অনাহারে যাইতেছে কিন্তু আহার্য্যের জন্য কোন চেষ্টা নাই। গৃহস্থেরা সাধু সেবার জন্য নানাবিধ সামগ্রী পাঠাইতেছেন, যাঁহার আসনে যেরূপ পড়িতেছে, তিনি তেমনি পাইতেছেন। কখন কখন মহান্তগণও সাধু-ভোজন করাইতেছেন, কোন কোন সাধুর আশ্রমে নিরন্তর সদাব্রত চলিতেছে! প্রতিদিন কত হাজার টাকার ধুনির কাঠ পুড়িয়াছে বলিতে পারি না, ইহাও গৃহীরা যোগাইয়াছেন। অধিকাংশ সাধুই এক একটী ছাতার নীচে একখানা চাটাই বা কম্বলাসনে উপবিষ্ট। কেহ কেহ ছাতা, কম্বল বা গাত্রাবরণ কিছুই ব্যবহার করেন না, যতদূর লোকাপেক্ষা না রাখিয়া থাকিতে পারেন, তাহারই চেষ্টা করেন। পাঠক, এইরূপ বেশভূষা ও সম্বল-সম্পত্তিযুক্ত হাজার হাজার লোকের একত্র-সমাবেশ চিন্তা করুন।

সাধুদিগের মধ্যে তিন সম্প্রদায় প্রধান ছিলেন, সন্ন্যাসী, নানকসাহী ও বৈষ্ণব। সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে দশনামা, দণ্ডী, পরমহংস ও শাক্ত প্রভৃতি শাখা এবং শাক্তের অন্তর্গত ভৈরবী ও আলেক প্রভৃতি উপ-শাখা ছিল। নানকসাহী দিগের প্রধান শাখা দুইটী, উদাসী ও শিখ। গুরু নানকের পুত্র শ্রীচাঁদের প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায় উদাসী এবং দশম গুরু গোবিন্দ সিংহের প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ের নাম শিখ। এতদ্ভিন্ন নানকসাহী সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন মহাপুরুষের প্রবর্ত্তিত দাদুপন্থী, গরীব-দাসী, বেহার-বৃন্দাবন প্রভৃতি নানাশাখা ছিল। বৈষ্ণব দিগের প্রধানতঃ চারিটী সম্প্রদায় ছিল। রামানুজ, মধ্বাচার্য্য, শ্রী ও নিম্বাদিত্য। এতদ্ভিন্ন কবীরপন্থী, গোরখনাথী, তপস্বী, ব্রহ্মচারী, নির্ব্বাণী, নিরঞ্জনী, প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় এবং শাখা সম্প্রদায় ছিল। সন্ন্যাসীরা মেলার উত্তরদিক, বৈষ্ণবেরা দক্ষিণদিক, এবং নানকসাহীরা মধ্যস্থল অধিকার করিয়াছিলেন। অন্যান্য সম্প্রদায় ও শাখা ইঁহাদিগেরই নিকটে নিকটে ছিলেন। ভৈরবীগণ বিশেষ পরীক্ষিতচরিত্র মহাত্মাগণের সন্নিকটে তাঁহাদের চক্ষের উপরে ছিলেন। ইঁহাদিগের কোন বিঘ্ন না ঘটে সেজন্য মহাত্মারা বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছেন। শুনিয়াছি অনেক দুশ্চরিত্র চোর ও বদমায়েসগণ সাধু সাজিয়া গোলে হরিবোল দিয়া মেলায় প্রবেশ করিয়াছিল কিন্তু সাধুরা জানিতে পারিয়া তাহাদিগকে ভয় দেখাইয়া তাড়াইয়া দিয়াছেন। বাহিরের কথা এইপর্য্যন্ত সমাপ্ত করিয়া ভগবানের কৃপায় যে কয়েকটী সাধুর বিষয় যাহা কিছু জানিতে পারিয়াছি তাহাই বর্ণনা করিব এবং সেই সঙ্গে প্রসঙ্গক্রমে কুম্ভমেলায় যাহা কিছু দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি তাহার কথঞ্চিৎ বলিব।

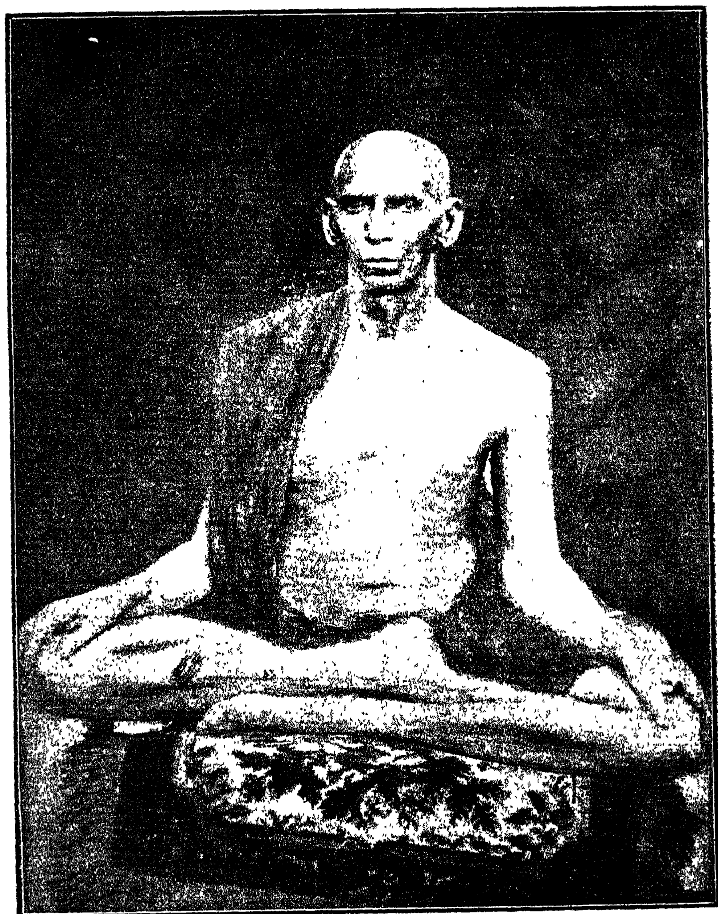
———

সাধু-দর্শন।

সিদ্ধাবধূত শ্রীমৎ দয়াল দাস স্বামী।

মহাত্মা দয়াল দাস নানকসাহী সম্প্রদায়েরই অন্তর্গত কিন্তু ইনি খাঁটি নানকপন্থী নহেন। গরীব দাস নামক এক সিদ্ধ-পুরুষ ছিলেন। তিনি একটী সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করেন, উহার নাম "গরীবদাসী" সম্প্রদায়। পঞ্জাব প্রদেশের বহু লোক এই সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছেন। মহাত্মা দয়াল দাস এই গরীবদাসী সম্প্রদায়ের একজন প্রধান ব্যক্তি। প্রসিদ্ধ বক্তা শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ-প্রসন্ন সেন মহাশয় দয়াল দাসেরই মন্ত্র-শিষ্য। তাঁহার আশ্রমে আমরা স্নানাহার করিলাম। দয়ালদাসের আশ্রমে যাহা দেখিলাম তাহা অতি অদ্ভূত ব্যাপার। আজানুলম্বিত-হস্ত, সুদীর্ঘকায়, গৈরিকধারী দয়ালদাসকে আমরা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলাম। তিনি আশীর্ব্বাদ করিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাত্মা দয়াল দাস কতকালের আত্মীয়ের ন্যায় ব্যবহার করিলেন, যে কয়েক দিন কুম্ভ মেলায় থাকিব, আমাকে তাঁহার নিকট থাকিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার মুখে কিছু উপদেশ শুনিলাম। গরীব দাসের যে সমস্ত উপদেশ আছে সে সকল অতিশয় দুর্ল্লভ। সেই সকলের যদি বাঙ্গালায় অনুবাদ হয়, তবে তাহা বাঙ্গালা দেশের একটী বিশেষ সম্পত্তি হইবে। দয়াল-দাস মহাশয়ের এক শিষ্যকে দেখিলাম, তিনি মাঘ মাসের

আরম্ভ হইতে কিছুই আহার করেন নাই, আমি যেদিন তাঁহাকে দেখিলাম সেদিন ২৪শে মাঘ। তিনি অতি বিনম্রভাবে আমাদিগকে কিছু কিছু ধর্ম্মোপদেশ দিলেন। শেষ কথা দয়াল দাসের সদাব্রত। দয়াল দাসের সদাব্রত কুম্ভমেলার একটী বিশেষ বিষয়। প্রয়াগে দুঃখী দরিদ্রের অন্ত নাই, কত লোক যে অনাহারে দিন কাটায়, তাহার খবর কে রাখে দয়াল দাসের আশ্রম-দ্বার একমাস কাল, তাহাদের জন্য সম্পূর্ণ উন্মুক্ত ছিল। অন্যান্য আশ্রমে কর্ত্তৃপক্ষের সাধু সেবার দিকেই বিশেষ দৃষ্টি থাকে, তাহার পরে কাঙ্গাল-সেবা। কিন্তু দয়াল দাসের নিকট সাধু কাঙ্গাল সকলই সমান। একদিন এক জন বলিয়াছিলেন যে, আপনার সাধু-সেবা অপেক্ষাও কাঙ্গাল-সেবার দিকে অধিক দৃষ্টি, ইহার কারণ কি তাহাতে দয়ালদাস উত্তর করিলেন, "সকলেরই এক এক প্রাপ্য অধিকার আছে। রাজার প্রাপ্য সম্মান ও অভ্যর্থনা, সাধুর প্রাপ্য শ্রদ্ধা ও অভিবাদন ইত্যাদি, সেইরূপ অন্ন কেবল ক্ষুধিত ব্যক্তিরই প্রাপ্য, তাহাতে সাধু অসাধুর বিচার কি? যদি পরিচ্ছদের মান মর্য্যাদা ধর, তবে গৈরিকধারী সন্ন্যাসিগণকে ভোজন করাইলে যদি সাধু ভোজনের ফল হয়, তাহা হইলে বস্ত্রাভাবে নগ্নপ্রায় এই সমস্ত কাঙ্গালদিগকে ভোজন করাইলে মহাদেব-ভোজনের ফল হইয়া থাকে।" মহাত্মা দয়াল দাসের সদাব্রত কি মহান্ ভাবব্যঞ্জক! দয়াল দাসের কোথাও কোন নির্দ্দিষ্ট আশ্রম নাই। তিনি বারমাস দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়ান এবং যখন যেখানে থাকেন, সেই খানেই প্রতিদিন হাজার হাজার



সিদ্ধাবধূত বাবা দয়ালদাস স্বামী

Emerald Ptg. Works Calcutta.

লোক তাঁহার অতিথি। কোন নির্দ্দিষ্ট আয়ের উপর তাঁহার নির্ভর নাই। শিলাবৃষ্টির ন্যায় চারিদিক হইতে টাকা ছুটিয়া আইসে, এক জন আসিয়া টাকা ঢালিয়া দিল, এক শিষ্য কুড়াইয়া নিয়া গেলেন এবং আর একজন খরচ করিয়া ফেলিলেন। "অর্থাপাদরজোপমা" এ কথা ইঁহাদের আচরণে প্রত্যক্ষ হয়। সংসারীর সাধ্য নাই, এভাবে অর্থ ব্যয় করে। ইহাঁদের ব্যবহার দেখিলে ঘোর সংসারাশক্তেরও বিষয়-বন্ধন অন্ততঃ পলকের তরে ছিন্ন হইয়া যায়। মহাত্মা দয়াল দাস বক্তৃতা ও কীর্ত্তন শুনিতে বড় ভালবাসেন। তাঁহার শিষ্য বাগ্মীবর শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয় মেলাস্থলে মাঝে মাঝেই বক্তৃতা করিতেন। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গীয় লোকদিগের কীর্ত্তন স্বামীজীর বড়ই ভাল লাগিয়াছিল। আমাদের কাছে সে কথা তিনি বলিয়াছিলেন। দয়াল দাস দয়ার সাগর ভক্ত-প্রেমিক, তিনি প্রেমহীন কর্ম্মী নহেন বা কর্ম্মহীন সন্ন্যাসী নহেন।

স্বামী দয়াল দাসের জীবন-কথা।

কণ্ঠে বড় বড় তুলসীর মালা, কপালে গোপী-চন্দনের ফোঁটা পরিধানে কৌপীনবহির্ব্বাস, হস্তে করঙ্গ, সুস্থকায়, দিব্যকান্তি, সহাস্য মুখ, দ্বাদশ বৎসর বয়স্ক একটী বালক, "জয় রাধেকৃষ্ণ, ভিক্ষা দেও গো মা" বলিয়া গৃহস্থের উঠানে দাঁড়াইল। একজন পরিহাস-রসিক বৃদ্ধ ব্যঙ্গ করিয়া বলিল, "ওহে বৈরাগী ঠাকুর, এত সকালে কেন অকাল ?" এ কথায়

অর্থ এই যে, এত অল্প বয়সে কেন বৈরাগী সাজিয়াছ? বালক-বৈরাগী একটু মৃদু হাসি হাসিয়া মধুর-স্বরে উত্তর করিল, "বাবা, যে'তে হবে যে বহুৎ দূর।"

প্রায় অধিকাংশ ধর্ম্মপিপাসুরই এই একই কথা। বাল্যকাল হইতেই তাঁহাদের মনে এই চিন্তা উপস্থিত হয় যে অনেক দূরে যাইতে হইবে। সিদ্ধাবধূত মহাত্মা দয়ালদাস ১২ বৎসর বয়সেই পথ চলিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন।

উজ্জ্বল নেত্র, সুগঠিত সুদীর্ঘ দেহ, আজানুলম্বিত বাহু, পরার্থপ্রাণ, নিত্যাভিযুক্ত স্বামী দয়ালদাস পঞ্জাবের অন্তর্গত কপিয়াল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা অতিশয় সাধুসেবা-নিরত ছিলেন। বালক দয়ালদাসও পিতার এই কার্য্যের সহায়তা করিতেন। এই শুভ কার্য্য হইতে সেই বাল্য বয়সেই তাঁহার চিত্ত-শুদ্ধি জন্মে এবং ধর্ম্মানুরাগের উন্মেষ হয়। সেই বয়সেই তিনি পাতিয়ালা জেলার বসেবা গ্রামে পরমহংস বাবা ঠাকুরদাসের নিকট দীক্ষা ও সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। সেই সময় হইতে ১৫ বৎসর কাল শাস্ত্র-শিক্ষা, যোগাভ্যাস এবং কঠিন তপশ্চরণ করিয়া গুরুর কৃপায় হৃদয়ে আরাধ্য দেবতার অনুগ্রহ লাভ ও আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করেন।

গুরুদেবের দেহের সমাধি হইলে দয়ালদাস তদুপলক্ষে একটী 'ভাণ্ডারা' দিয়াছিলেন। তাহাতে প্রায় দশ সহস্র সাধু-সন্ন্যাসী সেবা গ্রহণ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে নিঃসম্বল ব্যক্তির পক্ষে এরূপ কার্য্য সম্পন্ন করা একান্তই দৈবসাপেক্ষ।

এই ঘটনার পরে দয়ালদাস আর সেখানে থাকিলেন না। বহুলোক তাঁহাকে* গুরুস্থানে থাকিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া গোপনে তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হইলেন।

ইহার অল্প দিন পরেই বহুসংখ্যক ধর্ম্মার্থীর চিত্ত তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইল। তিনি যেখানে যান সেখানেই শত শত সাধু-সন্ন্যাসী ও শত শত অনাথ কাঙ্গাল তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকিত। তিনি জ্ঞানদানে ধর্ম্মার্থীদিগকে এবং অন্নদানে বুভুক্ষুদিগকে পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন। নিঃসম্বল সন্ন্যাসী কিরূপে প্রতি দিন শত শত, কখনও সহস্রাধিক লোককে অন্নদান করিতেন, ইহা বিশেষরূপে দেখিবার এবং ভাবিবার বিষয়। তিনি কাহারও নিকট কখনও কিছু প্রার্থনা করেন নাই এবং কাহাকেও কখনও অভাব বা প্রয়োজনের কথা জানান নাই। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিত যে, এত সামগ্রী কোথা হইতে আইসে, তিনি উত্তর করিতেন,—

"দেৎকো দেৎহুঁায় জ'াহা তাঁহা ছে আন্।
অন্‌দেৎ মাঁঙ্‌ৎ ফিরে সাহেব ন শুনে কান্॥"

যে ব্যক্তি পরের জন্য দান করেন, ভগবান্ যেখান হইতেই হউক, তাঁহাকে প্রয়োজনীয় বস্তু পৌছাইয়া দেন; যে ব্যক্তি দান করে না, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইলেও সে কিছুই পায় না, কেন না ভগবান্ তাহার কথা শুনেন না।

শ্রীমৎভগবৎগীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন,—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥"

অর্থাৎ যাহারা অনন্যচিন্ত হইয়া আমাকে উপাসনা করে, সেই নিত্যাভিযুক্ত ব্যক্তিদিগের আমিই প্রয়োজনীয় বস্তু আহরণ করিয়া দেই এবং সেই বস্তুর সংরক্ষণ করিয়া থাকি। অর্থাৎ ভগবান্ তাঁহাদের প্রয়োজনীয় বস্তুর সংগ্রহকারী এবং ভাণ্ডারী হইয়া থাকেন।

এই মহাবাক্যের উপর যে মহাপুরুষ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন, তিনিই নিশ্চিন্ত এবং নিরুদ্বেগ হন। কিন্তু কথার জোরে অথবা প্রতিজ্ঞার বলে এই নির্ভর উৎপন্ন হয় না। সাধনের একটী অবস্থা আছে, সে অবস্থায় আপনিই এই নির্ভর উপস্থিত হয়। নদীর সহিত সংযোগ করিয়া দিলে খাল বিল ও পুষ্করিণী প্রভৃতি যেমন আপনা আপনি জলে পরিপূর্ণ হইয়া যায়, সেইরূপ অনন্ত-করুণা-ভাণ্ডার সচ্চিদানন্দ শ্রীভগবানের সহিত সংযুক্ত হইলে সাধকের হৃদয় সর্বৈশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে।

"যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ।
আনন্দং ব্রহ্মনোবিদ্বান্ নবিভেতি কদাচনঃ।"

অর্থাৎ বাক্য ও মন যাঁহাকে না পাইয়া নিবর্ত্তিত হয়, সেই ব্রহ্মানন্দ যাঁহারা লাভ করেন, তাঁহারা কখনই ভয়প্রাপ্ত হন না।

স্বামী দয়ালদাস সেই ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়া মাতৃক্রোড়স্থ শিশু-সন্তানের ন্যায় নির্ভীক হইয়া গিয়াছিলেন। ক্ষুধার্ত্ত হইয়া সহস্র লোক তাঁহাকে বেষ্টন করিয়াছে, কপর্দ্দকশূন্য দয়ালদাস নির্ভয়-চিত্তে সকলকে আশ্বাস প্রদান করিতেছেন। সন্তানের কি প্রয়োজন মা আপনি তাহা দেখিতেছেন এবং ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী মাথায় বহিয়া সমস্ত বস্তু আনিয়া হাজির করিতেছেন, ছেলের আর ভাবনা কি?

জ্ঞানার্থীকে জ্ঞান ও উপদেশ দান, সাধকদিগকে নিশ্চিন্ত করিয়া রাখিয়া সাধনভজনের সুবিধা-প্রদান এবং সর্ব্বশ্রেণীর ক্ষুধিত দিগকে সমাদরে সু-খাদ্য বিতরণ, এই তিনটী কার্য্যই স্বামী দয়ালদাসের বিশেষ ব্রত ছিল।

আত্ম-পরিচয়।

একদিন তাঁহাকে কোন পাণ্ডিত্যাভিমানি-ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনি কি স্বামী ?" তিনি উত্তর দিলেন, "আমি কেবল স্বামী নহি, আমি দাস স্বামী।" ব্রাহ্মণ বলিলেন যে, সন্ন্যাসী ত কখনও দাস হন না, সন্ন্যাসিগণ স্বামী বলিয়াই আখ্যাত হইয়া থাকেন। তিনি উত্তর করিলেন, "সন্ন্যাসিমাত্রই স্বামী, সন্ন্যাসিমাত্রই দাস। নিজ নিজ শিষ্যের নিকট সকলেই স্বামী এবং নিজ নিজ গুরুর নিকট সকলেই দাস। স্বামী কেবল সন্ন্যাসী হইবেন কেন, সকলেরই কিছু কিছু স্বামীত্ব আছে, যথা ভূস্বামী, গৃহস্বামী ইত্যাদি। সন্ন্যাসিগণকে লোকে স্বামী বলিয়া ডাকে বটে কিন্তু সৎ-সন্ন্যাসিমাত্রেই আপনাকে দাস বলিয়া জানেন।"

ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কোন্ মঠের সন্ন্যাসী ?"

স্বামীজী। আমি গগন মঠের সন্ন্যাসী।

ব্রাহ্মণ। গগন-মঠের নাম ত কখনও শুনি নাই।

স্বামীজী। তুমি কোন্ কোন্ মঠের নাম শুনিয়াছ ?

ব্রাহ্মণ। শৃঙ্গগিরি মঠ, সারদা মঠ, গোবর্দ্ধন মঠ ও যোশী মঠ।

স্বামীজী। এ সকল মঠ কি সনাতন কাল হইতে প্রচলিত, না কাহার দ্বারাও নবীন-বিরচিত ?

ব্রাহ্মণ। শঙ্করাচার্য্য এই মঠমালা প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন।

স্বামীজী। তবে শঙ্করাচার্য্য ও তাঁহার গুরু শ্রীমৎগোবিন্দপাদ স্বামী কোন্ মঠের সন্ন্যাসী ছিলেন ?

এ কথায় ব্রাহ্মণ নিরুত্তর হইলেন। স্বামীজী বলিলেন, "পিতামাতার ও বংশের পরিচয় ছাড়িয়া দিয়া, সকল মান-সম্ভ্রমের হাত এড়াইয়া সন্ন্যাসী

হইয়া কি আবার পরিচয় দিতে হইবে? যেখানে সাম্প্রদায়িক পরিচয়, সেইখানেই অভিমান। মঠমালার রচয়িতা শঙ্করাচার্য্য ও তৎগুরুপরম্পরা কোনও মঠেরই সন্ন্যাসী ছিলেন না। তাই বলিতেছিলাম, 'আমি গগন-মঠের সন্ন্যাসী'।"

বস্তুতঃ স্বামী দয়ালদাস আপনাকে "দাস" বলিয়াই জানিতেন। প্রতিদিন যিনি শত শত লোককে অকাতরে অন্নদান করিতেন, তাঁহার অন্তরে বাহিরে বিন্দুমাত্র 'আমিত্ব' ছিল না।

এই উপলক্ষে একটী গল্প মনে পড়িল। কোন এক দাতা ব্যক্তি, তাঁহার প্রকাণ্ড ভবনের চারি সিংহদ্বারে দানের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। অসংখ্য লোক চারি দ্বারে দান গ্রহণ করিতেছে, কর্ম্মচারিগণ কোলাহল নিবারণ করিয়া অবিশ্রান্ত দান করিতেছেন। যিনি এই দানের কর্ত্তা, তিনি মুখ নত করিয়া এক স্থানে বসিয়া আছেন। একজন সাধু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"চারো দোয়ারে দেৎ হ্যায় নীচে কর্‌কে নয়েন।
সজ্জন কাঁহাছে শিখা এহ্ বিধিকা দেন?"

ইহার অর্থ এই যে, তুমি চারি দ্বারে দান করিতেছ অথচ নয়ন অবনত করিয়া রহিয়াছ, হে সজ্জন, এ প্রকারের দান তুমি কোথায় শিখিলে?

দাতা উত্তর করিলেন,—

"সাঁঞি সব্‌কো দেত্‌হ্যায় পোখত্ হ্যায় দিন রয়েন্
লোক নাম মের কহে তাতে নীচে নয়েন্।"

ভগবানই সকলকে দান করিতেছেন এবং দিনরাত্রি পোষণ করিতেছেন লোকে রটাইতেছে যে আমিই দান করিতেছি, এই জন্য আমি লজ্জায় চক্ষু নত করিয়া আছি।

বস্তুতঃ ভগবানই যে একমাত্র দাতা, মানুষ দাতা উপলক্ষ মাত্র, যিনি ইহা প্রত্যক্ষ করেন, তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী। দান করিতে গিয়া তাঁহার প্রাণে আমিত্বের সঞ্চার হওয়া ত দূরের কথা, পাছে তাঁহার দ্বারা এই কার্য্যের কোন প্রকার ত্রুটী ঘটে, এই ভয়ে তিনি সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকেন। স্বামী দয়ালদাস এই ভাবের মূর্ত্তিমান আদর্শ পুরুষ ছিলেন।

যাঁহার ভগবানে নির্ভর জন্মে তিনি কোন ব্যাপারে চিন্তিত বা বিচলিত হন না। এইরূপ সাধুর দর্শন লাভ করিলে, অবিশ্বাসীর প্রাণেও আস্তিকতার সঞ্চার হয়। মনে হয়, যেন রক্ষকরূপে ভগবান্ সর্ব্বদা ইঁহাদের সাক্ষাতে রহিয়াছেন এবং কাণে কাণে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন।

উপসংহার।

বঙ্গীয় ডাক-বিভাগের ভূতপূর্ব্ব সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রদ্ধেয় তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয় ১২৯৭ সালে হরিদ্বারে কুম্ভমেলা দর্শন করিয়া 'ধর্ম্মপ্রচারকে' লিখিয়াছিলেন,—

"এই মহামেলায় রাজা-রাজেন্দ্রবর্গের প্রতাপ অপেক্ষাও সন্ন্যাসী ও সাধুগণের প্রতাপ অধিক বলিয়া বোধ হইল।"

* * * *

"দেখিয়া প্রাণ জুড়াইল, হৃদয় শীতল হইল, চক্ষু সফল ও মানব-জন্ম পবিত্র হইল। এই মহা মহর্ষী-মেলার যে দিকে দৃষ্টি-পাত করি, সেই দিকেই যেন ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, তপস্যা ও ভক্তির ফোয়ারা ছুটিয়াছে দেখিতে পাই। এই মেলা প্রাণ ভরিয়া দেখিলে সংসারের লীলা-খেলা আর ভাল লাগে না, জীবের বৃথা মান-অভিমান যেন কোথায় পলায়ন করে।"

স্বামী দয়ালদাস সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"তিনি সমস্ত জনতার প্রান্তবর্ত্তী নির্ম্মল সৈকতভূমিতে তৃণাচ্ছাদিত কুটীরে আসন স্থাপন করিয়াছিলেন।

তাঁহার সঙ্গে শত শত পরমহংস অবধূত ভিন্ন ভিন্ন কুটীরে আসন করিয়া বাস করিতেছেন। তাঁহার সুদীর্ঘ কায়া, উজ্জ্বল চক্ষু, প্রসন্ন-বদন দর্শনে এবং গম্ভীর ও প্রেমাবেগপূর্ণ সম্ভাষণে হৃদয়মন পরিতৃপ্ত হয়।"

* * * *

"যখনই যাই তখনই দেখি কত কত শেঠ, সাহুকার, সর্দ্দার, সাধু-সন্ন্যাসী, মহান্ত, ত্যাগী, সংযোগী, স্ত্রীপুরুষ তাঁহাকে অনবরত দর্শন ও প্রণাম করিতেছে।"

* * * *

"যিনি কাহারও বাটীতে গমন করেন না, তাঁহার আশ্রমে প্রত্যহ অন্যূন চারি সহস্র সাধু-সন্ন্যাসী, গৃহস্থ-উদাসী, দুঃখী-কাঙ্গাল, আগন্তুক ও অভ্যাগত, পুরী, মালপুয়া, মোহনভোগ ও অন্ন-ব্যঞ্জনাদি তৃপ্তি-পূর্ব্বক ভোজন করিতেছে। বেলা দ্বিপ্রহর হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত তাঁহার অন্ন-সত্রের দ্বার উন্মুক্ত। বলিতে হয় না, কে যেন কোথা হইতে অর্থ ও সামগ্রী আয়োজন করিয়া দিতেছে। যখন যাই তখনই দেখি তাঁহার দরবারে হয় শাস্ত্রের ব্যাখ্যা, না হয় ভগবদ্-ভজন, সংকীর্ত্তন, না হয় সদ্বাক্যালাপ হইতেছে, মুহূর্ত্তমাত্র সময় তথায় অপব্যয়িত হয় না।"

বলা বাহুল্য ইঁহার সঙ্গে নিত্য-নিমন্ত্রণ লাগিয়াই আছে। শুনিয়াছি, মধুমক্ষিকাদলের রাণীটী যখন যেখানে যায়, ঝাঁকে ঝাঁকে মধুমক্ষিকা তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে থাকে। স্বামী দয়ালদাস যখন যেখানে যাইয়া আসন স্থাপন করিতেন, শত শত সাধু-সন্ন্যাসী তাঁহার অনুগমন করিতেন এবং মধুলুব্ধ মক্ষিকার ন্যায় দরিদ্র ক্ষুধাতুরগণ তাঁহার আশ্রম পরিপূর্ণ করিয়া থাকিত। তিনি অধিক দিন এক স্থানে থাকিতেন না, নানা তীর্থে গমনাগমন করিতেন, যেখানে যাইতেন সর্ব্বত্রই লোকারণ্য হইত।

তাঁহার ঈশ্বর-নির্ভর সম্বন্ধে শত শত উপাখ্যান আজিও লোকের মুখে মুখে বিচরণ করিতেছে। একবার গয়া হইতে স্বামীজী মণ্ডলী-সহ রাজগৃহে যাইতেছিলেন। সেই নির্জ্জন-স্থানে খাদ্য বস্তুর সংস্থান হইবে না ভাবিয়া ভক্তগণ আহারীয় দ্রব্যাদি সঙ্গে দিতে চাহিলেন। তিনি বলিলেন, "যদি গৃহস্থের মত সমস্তই সঙ্গে করিয়া লইতে হইবে, তবে গৃহ ছাড়িয়াছি কি জন্য?" রাজগৃহে পৌঁছিয়া সকলে দেখিলেন, এক ধনাঢ্য-ব্যক্তি সাধুসেবার ইচ্ছায় দ্রব্যজাত সহ তথায় অপেক্ষা করিতেছেন। স্বামীজী সঙ্গীদিগকে বলিলেন, "বিশ্বাস না করিয়া বোঝা বহিয়া দ্রব্যসামগ্রী আনিলে তোমরা বৃথা কষ্ট পাইতে মাত্র।"

১২৯৭ সালে হরিদ্বারের কুম্ভমেলা শেষ হইলে মণ্ডলীর এক জন সাধু আসিয়া বলিলেন, "এক জন দোকানদার ৭।৮ হাজার টাকার সামগ্রী যোগাইয়াছে; তাহার অধিকাংশ টাকা পরিশোধ হইয়া গিয়াছে কিন্তু এখনও আট শত টাকা বাকি আছে"। স্বামীজী হাসিয়া বলিলেন, "উদ্বিগ্ন হইও না। এই ঋণ-পরিশোধ করিয়া তুমি না হয় দুই শত টাকা সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইও।" তাহার পর দিন কোথা হইতে এক ধনাঢ্য ব্যক্তি আসিয়া স্বামীজীর চরণে এক সহস্র টাকা ভেট দিয়া প্রণাম করিলেন। দোকানীর টাকা দিয়া অবশিষ্ট দুই শত টাকা বাঁচিয়াছিল।

"কেহ কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, মেলায় যে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হইয়া গেল, তাহাতে দেশের কি কল্যাণ সাধিত হইল? এই অসংখ্য টাকার দ্বারা কতকগুলি স্থায়ী, ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হইলে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইত।" আমি অর্থব্যবহারশাস্ত্র বুঝি না কিন্তু 'কল্যাণ' শব্দটার একটা মোটামুটি অর্থ বুঝি। যাহাতে মানবাত্মার কল্যাণ হয়, অর্থাৎ হৃদয়-গ্রন্থি ভেদ হয়, তাহাকেই আমি

কল্যাণ বলি। সেরূপ কল্যাণ, অর্থের সদ্ব্যবহার দ্বারাও হইতে পারে, আর মুদ্রামুষ্টি ধূলিমুষ্টির ন্যায় ধরিয়া জলে ফেলিয়া দিলেও হইতে পারে। এক দিন মহাত্মা দয়ালদাসের নিকট কোন ধনী এক ব্যক্তি টাকা লইয়া করযোড়ে বলিলেন—"বাবা, আমার টাকাটা (সহস্রাধিক) তোমার আশ্রমে সাধুসেবায় লাগাইয়া দাও।" স্বামীজী বলিলেন,—"কি করিব বাবা, এখানে আর আজ্ঞ হইবে না; পূর্ব্বে যাহারা টাকা দিয়াছে, তাহাদের থাকিতে তোমার টাকা কিরূপে গ্রহণ করিব? তুমি অন্যত্র যাও।" এই দৃশ্যটী দেখিয়া আমার প্রাণের যে কল্যাণ হইল, সাধু যদি ঐ টাকা লইয়া কোনও বিশেষ সদ্ব্যয়ও করিতেন, তাহা দেখিয়া সেইরূপ কল্যাণ হইত কি না বলিতে পারি না। আর এক কথা এই যে, অর্থকে এইরূপ ধূলীর মতন না দেখিলে, শিলাবৃষ্টির ন্যায় টাকাও আসিত না।"

মহাত্মা দয়ালদাস তাঁহার জীবিত কালে কত লক্ষ লক্ষ দিনহীন ক্ষুধাতুরকে অন্নদানে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন; কত সহস্র সহস্র সাধু ও সাধককে সাজন-ভোজন প্রদান করিয়া নিশ্চিন্ত রাখিয়া ধর্ম্মসাধনে সহায়তা করিয়াছেন, কত সহস্র সহস্র ধর্ম্মার্থীকে নীতি ও ধর্ম্মোপদেশ দান করিয়া ভবরোগের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়াছেন, তাহার সীমা-সংখ্যা কে করিবে? এরূপ একজন লোক পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে জন্মগ্রহণ করিলে এত দিনে তাঁহার শত শত জীবনচরিত বাহির হইত। কিন্তু এই মহাপুরুষের কার্য্যবিবরণ ও দেহরক্ষার সংবাদ বাঙ্গালীর দ্বারা পরিচালিত কোনও সংবাদপত্রেই প্রকাশিত হয় নাই।

প্রয়াগ-কুম্ভমেলার অবসান হইলে স্বামী দয়ালদাস দুই শত সাধুসঙ্গে কুরুক্ষেত্রের পথে কানপুরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে গ্রহণী-পীড়ায় আক্রান্ত হইলে তাঁহার পরম ভক্ত পাতিয়ালার রাজমন্ত্রী

সর্দ্দার গুরুমুখ সিংহ সমগ্র মণ্ডলীসহ তাঁহাকে তথায় লইয়া গিয়া প্রাণপণে সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। ১৩০১ সনে ১৭ই ভাদ্র শুক্ল-দ্বিতীয়া তিথিতে উপস্থিত সাধুগণের সহিত সদালাপ করিয়া স্বামী দয়ালদাস সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। দেহত্যাগের সময় শতাধিক সাধু তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ছিলেন। সেই রাত্রে পঞ্জাব প্রদেশে অজস্র উল্কাবৃষ্টি হইয়াছিল। যে করুণার স্রোত অবিরত প্রবাহে প্রবাহিত হইয়া পঞ্জাব হইতে প্রয়াগ পর্য্যন্ত দেশদেশান্তরে অসংখ্য নরনারীর আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারণ করিতেছিল, সে স্রোত বাহ্যত শুকাইল! জগতের এক আদর্শ পুরুষ মানবলীলা সম্বরণ করিলেন! কিন্তু মহানদী মজিয়া গেলেও যেমন তাহার অন্তর-প্রবাহ বিলুপ্ত হয় না, মহাত্মা দয়ালদাসের করুণার ধারাও সেইরূপ তাঁহার শিষ্যদিগের মধ্যে প্রবাহিত হইয়া বহুসংখ্যক ক্ষুধিত ও ধর্ম্মপিপাসুকে এখনও অন্ন ও শান্তি প্রদান করিতেছে। তাঁহার উপযুক্ত শিষ্যবর্গ এখনও নানা স্থানে ধর্ম্ম ও অন্ন বিতরণ করিতেছেন। শিষ্যপরম্পরার মধ্য দিয়া দয়ালদাসের দান ও ধর্ম্মভাব চিরপ্রতিষ্ঠিত রহিবে, তাহার সন্দেহ নাই।

বাবা দয়ালদাসের পঞ্জাববাসি ভক্তগণ তাহার স্মরণার্থ হরিদ্বারে ষ্টেসনের সম্মুখে সাধু ও তীর্থযাত্রীদিগের বাসের জন্য অন্যূন পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে একটি সুবৃহৎ ধর্ম্মশালা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। দিল্লীর সমীপস্থ গুরুধামে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মঠ, সাধুগণ তাঁহারই পবিত্র নামে উৎসর্গ করিয়াছেন। কাশীধামে "মানস-সরোবর-মঙ্গল-মঠ" তাঁহার কানপুরবাসি ভক্তকর্ত্তৃক তাঁহারই স্মরণার্থ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এইরূপ বহু স্থান হইতে স্বামী দয়ালদাসের অনুকরণে ধর্ম্মপিপাসু ও দুঃখী কাঙ্গালদিগের জন্য অবারিত ভাবে ধর্ম্ম ও অর্থ বিতরিত হইতেছে।

স্বামী দয়ালদাস অসাধারণ বৈদান্তিক পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার রচিত বহুসংখ্যক দোহা তাঁহার শিষ্যবর্গের মুখে মুখে বিচরণ করিতেছে। তিনি জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির সাকারমূর্ত্তি ছিলেন। এরূপ মহাপুরুষের দর্শনলাভ ও পদধূলি গ্রহণ করিয়া সহস্র সহস্র শিক্ষিত বাঙ্গালী এবং হিন্দুস্থানী আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিয়াছেন। *

মহাত্মা করণ দাস।

দেখিলাম, একটী আশ্রমের বাহিরে প্রকাণ্ড প্রান্তরে প্রায় সহস্র দীন-দুঃখী লোক আহারে বসিয়াছে। আমরা আশ্রমের নিকটবর্ত্তী হইলে একটী পলিতশ্মশ্রু দিব্যকান্তি বৃদ্ধ অগ্রসর হইয়া আমাদিগকে নমস্কার পূর্ব্বক অতি বিনয়ের সহিত যোড়হস্তে অভ্যর্থনা করিয়া সাদরে আশ্রমের অভ্যন্তরে লইয়া গেলেন। তাঁহার কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, এই আশ্রমের মহান্তের নাম করণ দাস। ইনি নানকসাহী শিখ। এবং ইনিও একজন অন্নদাতা মহাপুরুষ। যাঁহার আশ্রমে প্রতিদিন সহস্র কি সহস্রাধিক দীন-দুঃখী এবং সাধুসজ্জন লুচি, মালপুয়া ও অন্ন প্রাপ্ত হয়, তাঁহাকে দেখিতে সহজেই আমাদের কুতুহল জন্মিল। পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন সাধুটী যখন আমাদিগকে করণদাসের তৃণ-কুটীরে লইয়া গেলেন, তখন দেখিলাম, দীর্ঘপাড় বিশিষ্ট একহস্ত পরিসর একখানা সামান্য ধুতী পরিয়া করণ দাস মহাশয় অতি

* এই প্রবন্ধের শেষ ভাগে "বিচার-প্রকাশ" নামক গ্রন্থ হইতে সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে।

সাধারণ লোকের ন্যায় বসিয়া আছেন। আমরা তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলাম। আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কোথায় আমাদের বাড়ী, আমরা কোথা হইতে আসিয়াছি ইত্যাদি নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। কতকালের পরিচিত-বান্ধবের ন্যায় ব্যবহার করিলেন। মানুষের প্রতি কি অপূর্ব্ব নির্ম্মল-সরল স্বাভাবিক প্রেম! তাহাতে বাহ্যচাকচিক্য বা কৃত্রিমতা কিছুই নাই। কাছে বসিলে আমাদের ক্ষুদ্র প্রাণটী ছুটিয়া গিয়া সেই মহাপ্রাণ-মহাত্মাগণের প্রাণে মিশিয়া যাইতে চায়। তাঁহাদিগের নিকটে গিয়া আর 'পর' হইয়া থাকা যায় না, কেমন যে একটী স্বাভাবিক স্নেহস্রোত আসিয়া হৃদয়কে শীতল করে, তাহা সম্ভোগ না করিলে অনুমানে বুঝা যায় না। এক দণ্ডের সাক্ষাতে তাঁহাদিগকে যেন কত কালের আত্মীয় বলিয়া মনে হয় এবং প্রাণের কোনও কথা বলিয়া ফেলিতে সঙ্কোচ বোধ হয় না। বস্তুতঃ সংসারের কৃত্রিম হাবভাবের মধ্যে প্রকৃত-সাধুসঙ্গ যে আমাদিগকে কি এক নূতন বস্তু দেখাইয়া দেয়, প্রাণের কাছে কি এক অকৃত্রিম স্বর্গশোভা খুলিয়া যায়, যে ব্যক্তি তাহা জানে নাই, একবারও অনুভব করে নাই, সে জগতের সর্ব্ব-প্রধান সুখেই বঞ্চিত রহিয়াছে। মহাত্মা করণ দাস ইঙ্গিতে আমাদিগকে তাঁহার আপন করিয়া লইলেন, আমরা বিনম্র-সন্তানের ন্যায় তাঁহার কাছে বসিলাম। তিনি আহারের জন্য বড়ই পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম যে, আমরা দর্শন করিতে বাহির হইয়াছি, এ সময়ে বিলম্ব করিতে ইচ্ছা নাই। তখন আমাদের ইচ্ছার প্রতিরোধ না

করিয়া, মা যেমন বিদেশগামি-সন্তানের হাতে সস্নেহে মিষ্টান্ন তুলিয়া দেন, তেমনি ভাবে ঠোঙ্গায় করিয়া আমাদের হাতে যথেষ্ট খাবার দিয়া দিলেন। আমরা তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলাম, তিনি আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দিলেন।

পণ্ডিত কেশবানন্দ—মহাত্মা করণ দাসের আশ্রম হইতে বাহির হইয়া অপর একটী আশ্রমে গেলাম, তখন সেখানেও সাধু ও কাঙ্গালী ভোজন হইতেছিল। আমরা একটা বেড়ার বাহিরে দাঁড়াইলাম, সাধুরা আমাদের কাছে আসিয়া আমাদিগকে আহারের জন্য বড়ই অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আমরা কোন ক্রমেই সম্মত হইলাম না, তখন তাঁহারা কিছু কিছু মিষ্টান্ন আমাদের হাতে দিয়া গেলেন। ইহাঁরাও নানকসাহী। এই আশ্রমের মহান্তের নামটী আমার মনে নাই। কিছুদূর যাইয়া আমরা পণ্ডিত কেশবানন্দের আশ্রমে উপস্থিত হইলাম। ইনিও নানকসাহী এবং অসাধারণ পণ্ডিত। পঞ্জাব প্রদেশের যত বড় বড় রাজা সকলেরই নিকট ইহাঁর অপ্রতিহত-প্রভাব। কেশবানন্দ খুব মহৎ লোক, কিন্তু তাঁহার বেশভূষা অন্যান্য সাধুদের মতন নহে। আমরা যখন তাঁহাকে দেখিলাম, তখন তাঁহার পরিধানে ধুতী, গাত্রে জরীর কাজ করা মকমলের অঙ্গাবরণ, বসিবার আসনাদি ও গৃহ-সজ্জা প্রভৃতি ধনিজনের উপযোগী। তাঁহার আশ্রম ৭।৮টী উৎকৃষ্ট তাঁবুতে আচ্ছাদিত। এখানেও অনেক লোক অন্ন প্রাপ্ত হয়। কেশবানন্দের মূর্ত্তি গম্ভীর ও জ্ঞানব্যঞ্জক। আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া অন্যত্র চলিলাম।

মহাত্মা রঙ্গিন বাবা।— ইঁহার প্রকৃত নামটী জানিতে পারি নাই। ইনি নানকসাহী "উদাসী" দলভুক্ত। নানা-রঙ্গের কাপড়ের টুক্‌রা জোড়াদিয়া ইনি পরিচ্ছদ করিয়াছেন। এলাহাবাদ কেল্লার নিকটে সুরদাসের আশ্রমে ইনি থাকেন। যখন নানকসাহীরা সাজ সজ্জার ঘটা করিয়া স্নানে চলিলেন, হস্তিপৃষ্ঠে বহুমূল্য ঝালর সকল ঝুলিল, স্বর্ণ-খচিত মক্‌মল-পতাকারাজি আকাশমার্গে উড্ডীন্ হইল এবং ডঙ্কাদির তুমুল ধ্বনিতে কিছু কালের জন্য সেই উদাসিনিবাস রাজপুত্রের বিবাহোৎসব-বাটিকার বিভ্রম জন্মাইল, সেই সময়ে এই বাবাজী ছুটাছুটী করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'হায় হায়, এই কি উদাসীনতা? ইহারই নাম কি বৈরাগ্য? গুরু নানক কি এইরূপ ধর্ম্মের উপদেশ দিয়াছেন? ইহারা যে মায়ার গোলাম" ইত্যাদি।

মেলাতে নানকসাহীদেরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জাঁক জমক ছিল। ব্যক্তিবিশেষের বিলাসিতার জন্য এরূপ হয় নাই কিন্তু বহুমূল্য নিশান ও হস্তী প্রভৃতি স্নানের সময়ে সঙ্গে লইয়া মহান্তকে রাজার ন্যায় সাজাইয়া নেওয়া ইহাঁদের প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আবার ইঁহাদের মধ্যে আর একটী বিষয়ও দেখিলাম। রাত্রিতে স্ত্রীলোকেরা সঙ্গীত গায়, সমস্ত উদাসী ও গৃহী নানক-সাহীরা একত্র হইয়া তাহা শ্রবণ করেন। গানগুলি ধর্ম্মসঙ্গীত এবং গায়িকারা আমাদের দেশীয় কীর্ত্তনওয়ালীশ্রেণীর স্ত্রীলোক। আমরা একদিন এই সঙ্গীত শুনিলাম, মন্দ লাগিল না। রঙ্গিনবাবা প্রকৃত উদাসী, তাঁহার এ সব ভাল লাগে না, বস্তুতঃ

ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে অধিক জাঁক-জমক কি স্ত্রীলোকদিগের সঙ্গীত অনেক উদাসি সাধুরা পছন্দ করেন না।

মহাত্মা স্বামী ভোলানন্দগিরি।

ইনি দণ্ডি সন্ন্যাসী। মেলার মধ্যে ইনি একজন বিশেষ প্রভাবশালি ব্যক্তি ছিলেন। কে কত বড় সাধু তাহা কুম্ভমেলায় গেলে কিঞ্চিৎ বুঝাযায়। যে সকল লোককে রাস্তা ঘাটে গায়ে ছাই মাখিয়া অতি সাধারণ ভাবে পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়, যাহাদিগকে বাহ্যদৃশ্যে ব্যবসায়ি-সাধু বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস, তাহাদের মধ্যে অথবা ঐরূপ বেশে ও ভাবে সময়ে সময়ে এমন মহাত্মাও লুক্কায়িত থাকেন, সাধুরা যাঁহাদিগকে মহাপুরুষ বলিয়া পূজা করেন। মহাত্মা ভোলাগিরিকে কলিকাতায় যাঁহারা কখন কোন ঘাটে কি কখনও কোন আস্ত-বলের কাছে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছেন, কুম্ভমেলায় তাঁহার প্রভাব দেখিলে তাঁহারা অবাক্ হইয়া যাইতেন। বহুমূল্য বস্ত্রা-বাস-রাজিতে ইহাঁর আশ্রম সুশোভিত। অর্দ্ধহস্ত উচ্চ মক্‌মলের গদিতে তাঁহার বসিবার স্থান। কত শত শত লোক তাঁহার আশ্রমে নিরন্তর আহার পাইতেছে, সমারোহের সীমা নাই। স্নানের দিনে সন্ন্যাসি দল ইহাঁকে সুবর্ণ-খচিত বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরাইয়া, বিচিত্রসাজে সুসজ্জিত অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া ইঁহারই অনুগমন করিয়াছিলেন। ইঁহার এক শিষ্যের নাম পরমানন্দ গিরি। তিনিও একজন অসাধারণ ব্যক্তি। সন্ন্যাসীর এরূপ সাজ-

সজ্জা ও ঐশ্বর্য্যের কথা শুনিয়া হয়ত কেহ বিরক্ত হইতে পারেন, সেইজন্য ব্যাপারটা পরিস্কার করিয়া বলা উচিত। বড় বড় রাজা এবং জমিদারগণ ইহাদিগের সেবার জন্য এই সমস্ত রাজযোগ্য বস্তু প্রদান করেন। কিন্তু সে সমস্ত ব্যবহারের দিকে ইঁহাদের একেবারেই মনোযোগ নাই। ইঁহারা প্রায় সর্ব্বদাই কৌপিন বহির্ব্বাস মাত্র পরিয়া সামান্য আসনে উপবেশন ও সামান্য ভাবে জীবন-যাপন করেন। স্নান প্রভৃতির সময় সাম্প্রদায়িক রীতি অনুসারে সাজসজ্জা গ্রহণ করেন। এক দিন ঝড় বৃষ্টি হওয়ায় সাধুদের বড়ই ক্লেশ হইয়াছিল, পরদিন এই সকল মহাত্মা কৌপিন-মাত্র পরিয়া বৃষ্টিতে সর্ব্বাঙ্গে কাদা মাখা হইয়া সমস্ত মেলায় সকল সাধুগণের কি কি অসুবিধা ঘটিয়াছে তাহারই তত্ত্ব করিয়া বেড়াইয়াছেন। ইঁহাদের তখনকার দীন হীন অমায়িক ভাব অতি আশ্চর্য্য দেখা গিয়াছে। অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এই সকল সাধুরা বিষয়ের মধ্যে বাস করিয়াও সম্পূর্ণ অনাসক্ত ভাবে চলিয়া যাইতেছেন। ভোলাগিরির এক শিষ্য পরমানন্দগিরি অনেক সময় সমাগত যাত্রীদিগকে অতি মধুর ভাবে উপদেশ প্রদান করিতেন। তিনি বলিতেন "দেখ, তোমরা তীর্থে আসিয়া এক একটী খাদ্য-ফল ত্যাগ করিয়া যাইতেছ কিন্তু ইহাতে বিশেষ উপকার কিছুই নাই। তোমরা যদি কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, পরনিন্দা, মিথ্যাকথা ইহারই এক একটী পরিত্যাগ করিতে পার, আর সর্ব্বদা মনে রাখিতে পার যে তোমরা এ বৎসর প্রয়াগে যাইয়া অমুক পাপকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়াছ, তাহা

হইলেই প্রকৃত কল্যাণ হয়, তীর্থ ভ্রমণের ফল হয়," ইত্যাদি। ইহাঁদের ও আতিথ্য অতি চমৎকার! লোককে খাওয়াইতে ইঁহারা কতই ব্যস্ত এবং খাওয়াইয়া কতই আনন্দিত! (৫)

১৩০০ সনে প্রয়াগ ধামে কুম্ভমেলা শেষ হইয়া গেলে পরের বৎসর ভোলাগিরি মহাশয় কলিকাতায় আসিয়া, বড় বাজারের নিকটে হেরিসন রোডে একটী ত্রিতল বাটির উপরের তলায় ছিলেন। সেখানে অনেক সুশিক্ষিত বাঙ্গালী ভদ্রলোক তাঁহাকে দর্শন করিতে ও তাঁহার নিকট উপদেশ লাভ করিতে প্রত্যহ সমবেত হইতেন। এই "কুম্ভ-মেলা" গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হইলে বঙ্গদেশের বহু শিক্ষিত লোকের চিত্ত সাধু দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল। ভোলাগিরি মহাশয় কলিকাতায় আসিলে বঙ্গভূষণ সমাজরত্ন পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত স্যার গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয় একদিন আমাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। আমি বন্দোপাধ্যায় মহাশয়কে বলিলাম যে খালিহাতে সাধুদর্শন করিতে যাইতে নাই, অমনি তিনি গাড়ী থামাইয়া বড়বাজার হইতে কিছু ফল কিনিয়া লইলেন। আমি স্বামীজীর নিকট তাঁহার পরিচয় দিলাম। তিনি আমাদিগকে বসিতে ইঙ্গিৎ করিলেন, আমরা প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলাম। বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের কোন প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজী বলিয়াছিলেন যে, "আপনি যেরূপ অতি-সাধারণ-পোষাক পরিয়া আসিয়াছেন, এখন কোন দোকানে যাইয়া যদি আপনি এক জোড়া কাপড় বাকিতে চাহেন কেহই আপনাকে তাহা দিবে না কিন্তু সেই দোকানদারকে যদি আপনি কোন প্রকারে জানিতে দেন যে আপনি হাইকোর্টের জজ গুরুদাস বাবু, তখন সে তাহার দোকানের সমস্ত

জিনিষ আপনাকে ধারে দিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হইবে না। এইরূপ প্রকৃত-সাধুগণ যতদিন নিজকে প্রকাশিত করিতে ইচ্ছা না করেন ততদিন তাঁহাদিগকে বাজারের লোকেরা (সংসারের লোকেরা) চিনিতে পারে না, মনে করে এ ব্যক্তি সামান্য ভিখারী কিন্তু প্রয়োজন মত তাঁহারা যখন আত্মপ্রকাশ করেন তখন অনেকেই চিনিতে পারে। কিন্তু আপনি যে পোষাকেই থাকুন পরিচিত লোকদিগের নিকট লুকাইতে পারিবেন না। সেইরূপ যাঁহাদের সাধু চিনিবার মতন দৃষ্টি আছে, তাঁহাদের কাছে কোন সাধুই লুকাইতে পারে না।”

স্বামীজীর উপদেশ খুব মিষ্টি লাগে; তখন তিনি দুই একটী বাঙ্গালা শব্দ মিশাল দিয়া কথা বলিতেন, এখন বেশ বাঙ্গালা বলিতে পারেন।

সিটি কলেজের অধ্যক্ষ ৺ উমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ ব্রাহ্মসমাজের কয়েক জন ধর্ম্মপিপাসু ব্যাক্তি স্বামীজীর সঙ্গে আলাপ করিয়া বিশেষ পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন।

জানিনা কি কারণে এই সময় স্বামীজী আমার মতন সামান্য ব্যাক্তিকে শ্রীশ্রী কবীর সাহেবের কতকগুলি দোঁহার বাঙ্গালায় পদ্যে অনুবাদ করিতে আদেশ করেন। তখন আমি হিন্দি ভাষা মোটেই জানিতাম না বলিলে অত্যুক্তি হয় না, তাহাতে আবার কবীর সাহেবের ভাষা, গোঁসাই তুলসীদাস প্রভৃতির ভাষার ন্যায় সরল ও সংস্কৃত-বহুল নহে, উহা একান্ত গ্রাম্য শব্দে পরিপূর্ণ বিশেষতঃ কবীর সম্প্রদায়ের আচার্য্যদিগের নিকট পাঠ না করিলে কবীরের ভাব বুঝা একরূপ অসাধ্য, কাজেই স্বামীজীর আদেশ শুনিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। তিনি আমাকে প্রতিদিন নিয়মিত রূপে নিজে পড়াইতে লাগিলেন। এই সম্বন্ধে ইহার পরে প্রায় ১৫ বৎসর

কাল যাহা যাহা ঘটিল এস্থলে তাহা লিখিতে গেলে একটু অপ্রা-সঙ্গীক হইবে। ভগবানের কৃপায় যদি স্বামীজীর আদেশ পালন করিতে পারি তখন সে সমস্ত কথা প্রকাশিত হইবে। শীঘ্রই সে গ্রন্থ প্রকাশ করিতে ইচ্ছা রহিল। কবীরের সেই সকল অমূল্য উপদেশ যাহাতে বাঙ্গালা ভাষায় অনূদিত হয়, বাঙ্গালীরা যাহাতে ভ্রান্তিতে না পড়িয়া সেই রসের প্রকৃত আস্বাদ পায় তজ্জন্য স্বামীজীর অত্যন্ত আগ্রহ দেখিলাম। বাঙ্গালী জাতির উপর সাধুদের বিশেষ কৃপা-দৃষ্টি পড়িয়াছে।

সাধুদিগের অনুভূতি কেমন তীক্ষ্ণ ও তীব্র এবং আত্মদর্শন কত দূর সূক্ষ্ম ইঁহাদিগের ব্যবহারিক নিত্য কার্য্যের মধ্য দিয়া না দেখিলে তাহা বুঝা যায় না। সকল মানুষইত দেখিতে প্রায় একরূপ, সকল সাধুদেরই সাধুর পরিচ্ছদ এবং সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে নানা প্রকারের উৎকৃষ্ট ও উচ্চদরের কথা বলিতে পারেন কিন্তু প্রকৃত মহাপুরুষদিগের দৈনিক ছোট ছোট কার্য্যের মধ্যে এমনই বিশেষত্ব আছে যে, কোন সাধারণ ব্যক্তিই সে সকলের অনুকরণ করিতে পারিবে না। একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি।

ভোলাগিরি মহাশয় প্রভুপাদ ৺ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়কে "আশুতোষ" বলিয়া ডাকিতেন। একদিন তিনি কথা প্রসঙ্গে কোন কোন লোকের নিকট বলিয়াছিলেন যে, আশুতোষের নিকট বহু লোকের সমাগম হয়, এত লোক-সংঘট্ট ভাল নয়",। এই কথা যে দিন হইয়াছে তাহার পরের দিনই সকাল বেলায় আমি গঙ্গাস্নান করিতে যাইয়া ফিরিয়া আসিতে স্বামীজীকে প্রণাম করিতে তাঁহার বড় বাজারের বাসা বাটীতে গেলাম। আমি প্রণাম করিলে তিনি আমাকে বলিলেন "বড়ই ভাল হইয়াছে যে তুমি আসিয়াছ, কালকার

সারা রাত্রে আমার ভাল ঘুম হয় নাই, একটা যন্ত্রণা বুকে লইয়া আমি রাত্রি কাটাইয়াছি। আমি এইরূপ একটা মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম যে, আশুতোষের (গোঁসাইজীর) নিকট বড়ই লোক-সংঘট্ট হয়, এতটা হওয়া ভাল নয়। এই কথা বলার পরে আমার মনে বড়ই ক্লেশ হইয়াছে। যাঁহারা আচার্য্য-ভাবে আসেন, তাঁহাদের নিকট লোক-সংঘট্ট ত হইবেই হইবে। গর্গ ও যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিগণ সহস্র সহস্র শিষ্য দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া থাকিতেন। তুমি আশুতোষকে বলিবে যে, আমি তাঁহার সন্তান, আমি যে অপরাধ করিয়াছি তাহার জন্য তিনি যেন আমাকে ক্ষমা করেন।"

আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। যে কার্য্য করিলে অন্যলোকের মনে কিছু মাত্র অনুতাপ জন্মিত না, তাহাই করিয়া ইঁহার এত অনুতাপ হইল! "বেশীলোক-সংঘট্ট ভালনয়" এইরূপ একটা কথা বলিয়া যে মনে ক্লেশ হইতে পারে এবং সেইজন্য রাত্রির সু-নিদ্রা বন্ধ হইতে পারে, ইহা ত অনেকের চিন্তার ও অগোচর। এইরূপ দৈনিক-জীবনের প্রতিদিনের ছোট ছোট কাজের মধ্য দিয়াই সাধুদিগের মহিমা প্রকাশিত হয়। বড় বড় কাজে কি বড় বড় উপদেশ-দানে পরিপাটা থাকা বিশিষ্টতার বিশেষ লক্ষণ নহে। শিক্ষার প্রভাবে এবং সভ্যতার খাতিরে অনেকে ভদ্র সাজিতে পারেন কিন্তু সেরূপে সাধু সাজা যায় না, ছোট ছোট কাজেই ধরা পড়িয়া যায়। অন্তর-তম প্রদেশ হইতে যে সদ্ভাব গুলি আপনি ফুটিয়া উঠে, উহাই সাধুতার লক্ষণ।

আজ ১৫ বৎসর হইতে স্বামী ভোলানন্দগিরি প্রায় প্রতিবৎসরই শীত-ঋতুতে কলিকাতায় আসিতেছেন। হরিদ্বারে তাঁহার আশ্রম প্রতিষ্টিত হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন-স্থানের বহুসংখ্যক নরনারী তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। যে সকল লোক কোনও ধর্ম্মই

মানিত না, একান্তই স্বেচ্ছাচারী ছিল, সেরূপ বহু বহু লোকও তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শান্তিলাভ করিয়াছে।

স্বামীজীর শিষ্যবর্গের মধ্যে আমিষ আহার একেবারে নিষিদ্ধ।

মহাত্মা অমরানন্দ স্বামী।— দাক্ষিণাত্যে নাসিকে ইহাঁর পূর্ব্বাশ্রম। ইনি একজন বিশেষ প্রতিভাশালি-ব্যক্তি। সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে অনেকেই প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ এবং তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গগণের বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। কিন্তু এই স্বামীজী চৈতন্য-ধর্ম্ম সবিশেষ জানেন। ইনি পাঠ্যাবস্থায় ন্যায়শাস্ত্র পড়িতে নবদ্বীপধামে ছিলেন, সেখানে থাকিয়াই ইনি গৌড়ীয়-বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবগত হইয়াছেন। ইনি বলিলেন "গৌরাঙ্গ যে ভাবে বেদান্তের ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাই ঠিক। শঙ্করের অভিপ্রায়ও ঐরূপই ছিল, কেবল না বুঝিয়া গোল হইয়াছে।" মহাত্মা অমরানন্দ একজন প্রসিদ্ধ-পণ্ডিত।

মহাত্মা মৌনী বাবা।— অনন্তাশ্রমে মৌনী বাবা ছিলেন। অনন্তাশ্রম সন্ন্যাসিনিবাসেরই এক অংশে অবস্থিত। ইনি দেখিতে ভোলা-নাথ পুরুষ, স্থূলাকার, মুণ্ডিত-মস্তক, কৌপিন-মাত্র-পরিহিত। একখানা লম্বা কুটীরের এক প্রান্তে আপনার মনে আপনি বসিয়া আছেন। ইহাঁকে দেখিলে ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে মনে পড়ে। শুনিলাম ইনি অসাধারণ ব্যক্তি। সন্ন্যাসীরা অনেকে শুষ্কজ্ঞানানুরাগী, কিন্তু ইনি সেরূপ নহেন। যদিও কথা না বলায় ইহাঁর মতামত কিছু জানা যায় না কিন্তু এক দিন এক স্থানে কীর্ত্তন শুনিয়া ইহাঁর শরীর এরূপ কম্পিত হইতে লাগিল যে, সকলেই তাহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিলেন।

মহাত্মা কেশবানন্দ স্বামী।— সন্ন্যাসিদলে ইনিই একমাত্র বাঙ্গালী ছিলেন। কলিকাতার সন্নিকটে ইহাঁর পূর্ব্বাশ্রম ছিল। ইনিও

সাধুদিগের মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। কেশবানন্দ অনেক কঠিন রোগের ঔষধ জানেন, এজন্য অনেক বড় বড় ধনিলোক ইহাঁর বশীভূত। ইনি রোগ আরাম করিয়া অর্থ গ্রহণ করেন, এরূপে ইঁহার প্রচুর অর্থ সংগ্রহীত হয় কিন্তু তাহা দ্বারা নিজের সুখভোগের কোন বন্দোবস্ত করেন না, কেবল সাধু ও কাঙ্গালী সেবায়ই সেই সকল অর্থ ব্যয়িত করেন। ইহাঁর আতিথ্য অতিশয় প্রসিদ্ধ, মেলাতে বহুলোক ইহাঁর আশ্রমে আশ্রয় লাভ করিয়াছে। ইহাঁর প্রকৃতিও অতিশয় মহান্

মহাত্মা নেঙ্গা বাবা। এলাহাবাদে দুর্গের নিম্নে একটী বট-বৃক্ষতলে ইহাঁর আশ্রম। লোকেরা ইহাঁকে নেঙ্গাপরমহংস বলে। হরিনাম, কৃষ্ণনাম বলিতে ইঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। ইহাঁর উদারতাও অতি আশ্চর্য্য। দাদুপন্থীরা কোন শাস্ত্র মানেন না, এজন্য শাস্ত্রমুখী হিন্দুগণের তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকারই কথা। একদিন একজন দাদুপন্থী, নেঙ্গা বাবার আশ্রমে উপস্থিত হইলে তিনি উপস্থিত অন্যান্য সকলকে বলিলেন যাঁহার বড় ভাগ্য সেই দাদুপন্থী হইতে পারে কারণ ইঁহারা কেবল নিষ্ঠার সহিত গুরুবাক্য মানিয়া চলেন। তিলক, মালা, ভেক নিয়া অনেকে মনে করেন সাধু হইয়াছেন কিন্তু দাদুপন্থ-দিগের দৃষ্টি অন্তর-শুদ্ধির দিকে"। আরও বলিলেন "শাস্ত্র আর পন্থা, ইহার একটী ধরিয়া চলিলেই হয়। শাস্ত্র ঋষির বাক্য, পন্থা কোন সিদ্ধ পুরুষের প্রদর্শিত পথ, তাহাতে চলিলেও স্থানে পৌঁছান যাইবে"। আমরা সচরাচর দেখি আমাদিগের মধ্যে গৃহেই হউক, বা সভাস্থলেই হউক, বিরুদ্ধমতাবলম্বী দুজন লোকের একত্র মিলন হইলে তাঁহাদের আলোচনার পরিণাম প্রায়শঃই তিক্ত হয়, কিন্তু সাধুদিগের প্রণালী ভিন্ন। বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদিগের মধ্যে দোষ গুণ উভয়ই আছে, আমাদের দৃষ্টি, দোষের দিকেই আগে ছুটে সুতরাং আমরা গুণ ফেলিয়া দোষেরই

আলোচনা করি, সাধুদিগের চক্ষু আগেই পরস্পরের গুণ দেখে, কাজেই তাঁহাদের আলাপের পরিণাম মিষ্ট হয়।

নেঙ্গা বাবার দীনহীনতা ও প্রচুর। তিনি বলেন "আমি প্রয়াগ রাজের দ্বারবান, আমাকে না দেখা দিয়া কেহ রাজ-বাটীতে প্রবেশ করিতে পারেন না।

বৈষ্ণব।

মহাত্মা রামদাস কাঠিয়া বাবা।

ইনি বৃন্দাবনের চৌরাশী ক্রোশের মহান্ত। সাধুরা ইঁহাকে 'ব্রজবিদেহী' বলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ইনি দেহে থাকিয়াই মুক্তিলাভ করিয়াছেন। বৃন্দাবনের লোকেরা এবং অন্যান্য সাধুবর্গ ইঁহাকে জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ বলিয়া জানেন। সুগঠিত অটুট শরীর বার্দ্ধক্যকে উপেক্ষা করিয়া আপনার যৌবন-পুণ্যের উজ্বল প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছে। সুপক্ক-কেশরাশি গ্রীবাদেশ পর্য্যন্ত বিলম্বিত, একটী বৃহৎ ছত্রের নীচে অতি সামান্য কম্বলাসনে ইনি বিভুতি-ভূষিত হইয়া বসিয়া আছেন। শারীরিক গঠন, দৃষ্টি, উপবেশন সমস্তই অতিশয় দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক। পরিধানে মাত্র একটী কাঠের কৌপীন। কাঠের কৌপীন পরেন বলিয়াই ইহাঁদিগকে কাঠিয়া বাবা বলে। তিনি যে কত বড় একজন

প্রভাবশালী লোক, কত শত শত লোক যে তাঁহার আজ্ঞাধীন, কত রাজা মহারাজা যে তাঁহার আদেশ পালন করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতে চাহেন, তাহা বাহির দেখিয়া কিছুই জানিবার উপায় নাই। যেরূপ শত শত সন্ন্যাসীকে বঙ্গদেশের গৃহস্থেরা অনাদর-বাক্যে গৃহদ্বার হইতে দূর করিয়া দেয়, ব্রজবিদেহী কাঠিয়া বাবার বেশভূষায় তাহাদের হইতে কোন পার্থক্য নাই। এক সময় গোয়ালিয়ারের মহারাজা ইহাঁর নিকট করযোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, "আমি মহারাজজীর কি সেবা করিতে পারি?" তাহাতে রামদাস বলিলেন, "বাবা, আমার কোন সেবা নাই, তুমি আনন্দে থাক।" ইনি অনাসক্ত জীবন্মুক্ত পুরুষ। একটী শিষ্য পায়ের নিকট উপবেশন করিয়া গুরুদত্ত নাম জপ করিতেছেন, আর অশ্রুজলে ভাসিয়া যাইতেছেন। এত লোকসমারোহ, কথোপকথন গোলমাল, কিন্তু তাহার কোন দিকেই ইঁহার দৃষ্টি নাই। ঠিক পতি-বিয়োগ-বিধুরা সতীর ন্যায় কাহার ধ্যান ধারণায় যে তিনি মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন, তাহা অন্যে কি বুঝিবে? মনে হয় সেই হারাধন লাভ না করিয়া তিনি বুঝি আর সংসারের কোলাহল শুনিবেন না। চঞ্চলচিত্ত আমরা, একনিষ্ঠতা কিরূপ জানিলাম না, অনুরাগের কথা শুনিলাম কিন্তু অনুরাগ কি বুঝিলাম না, এইরূপ আশাবদ্ধ-সমুৎকণ্ঠিত সাধকের দর্শন-লাভ আমাদের পক্ষে মহাপুণ্য। কাঠিয়া বাবা জ্ঞানপ্রেমের মূর্ত্তি, শুনিয়াছি, যে তাঁহার নিকট দু-দিন থাকে, সেই তাঁহার আপন হইয়া

যায়। এই মেলাতে বৈষ্ণবদল তাঁহাকেই অগ্রণী করিয়া স্নান করিয়া ছিলেন। সম্প্রতি মেলাবসানে তিনি নিজ আশ্রম বৃন্দাবনে গিয়াছেন। তাঁহার আশ্রম রাধাকুণ্ডে।

শ্রী শ্রীরামদাস কাঠিয়া বাবার জীবন কথা।

এক এক জন সাধু পুরুষ এক একটা প্রকাণ্ড অন্নসত্ররূপে বিরাজিত থাকিয়া ধর্ম্মার্থীদিগকে যেরূপ নীতি ও সংরূপ অন্নজল বিতরণ করেন, তাহা দেখিলে ভক্তিভরে তাঁহাদের চরণে হৃদয় অবনত হইয়া পড়ে! কিন্তু হায়, সেই সকল সাধু-পুরুষদিগের সঙ্গে আমাদের দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত লোকের পরিচয় নাই!

সে দিন আমার আত্মীয় একটী বিলাত-ফেরত যুবক আমাকে বলিল, 'সাধুরা আমাদিগের নিকট আসিয়া উপদেশ প্রদান করেন না কেন?' আমি বলিলাম "তোমরা তাঁহাদের নিকট যাও না কেন"? যুবক বলিল 'আমরা কোথায় তাঁহাদের খুঁজিয়া মরিব?' আমি বলিলাম, অর্থোপার্জ্জনের জন্য দেশে দেশে ঘুরিতে পার, আর সাধু দর্শনের জন্য একটু নাড়িতেও পার না, ইহাতেই বুঝাযায় যে তুমি অনধিকারী, ধর্ম্ম লাভের জন্য তোমার এতটুকু ব্যাকুলতা নাই সুতরাং তোমার মত অনধিকারীর নিকট সাধুরা বৃথা কথা ছড়াইতে আসিবেন কেন? রত্ন কাহাকেও অন্বেষণ করে না, রত্নকেই অন্বেষণ করিয়া বাহির করিতে হয়।'

বিলাত-ফেরত যুবকটীকে এই কথা বলিয়া আমি মনে মনে ভাবিলাম, যে, সাধু দেখিয়াই বা ইহারা সহজে কিরূপে চিনিয়া লইবে? অনেক সাধুই দুইটী ভাবে চলেন, একটী "প্রচ্ছন্ন ভাব" ও অপরটী "প্রকট-ভাব"। প্রচ্ছন্ন ভাবে তাঁহারা যে সকল আচরণ করেন তাহা দেখিয়া

অনভিজ্ঞ লোকেরা তাঁহাদিগকে সাধু বলিয়া চিনিতে পারে না। কোন মহাপুরুষ হয় ত গরুর জন্য ঘাস কাটিতেছেন, কেহবা একটা সামান্য বিষয় লইয়া এক জনকে গালাগালি করিতেছেন, তুমি ত প্রথম দর্শনেই বিরক্ত হইয়া তাঁহার নিকট হইতে পলায়ন করিবে। পাঁচ সাতদিন চাপাটী খাইয়া কম্বলে শয়ন করিয়া তাঁহার দিবা রাত্রির ক্রিয়া কর্ম্ম দেখিতে তোমার শক্তি ও প্রবৃত্তি নাই সুতরাং একটী ডাব নারিকেলের ছোবড়া চিবাইয়া সেটাকে নীরস বলিয়া পরিত্যাগ করার মতন বাহিরের দুই একটা আচরণ দেখিয়াই সাধুকে পরিত্যাগ করিবে, তোমার কল্পিত-সভ্যতার সঙ্গে যদি তাঁহার ব্যবহারের কিছুমাত্র অমিল হয়, তখনই তাঁহার উপর চটিয়া যাইবে।

সাধুদের একটী স্বতন্ত্র সভ্যতা আছে, পরিষ্কার পোষাক পরিচ্ছদ অথবা ঢাকা চাপা কথাবার্ত্তা (Politeness) সে সভ্যতার পরিচায়ক নহে, উন্মুক্ত-হৃদয় এবং অপকট আচরণই তাঁহাদের সভ্যতার বিশিষ্ট উপাদান। সে সভ্যতা বুঝিয়া লওয়ার জন্য অভিজ্ঞতা না থাকিলে অনেক সময় তাঁহাদের আচার ও আচরণ দেখিয়া আমাদের সভ্য লোকেরা বিরক্ত হইয়া যান। আহা! শরদের নির্ম্মল আকাশের মতন মহাপুরুষ-দিগের উন্মুক্ত নির্ম্মল হৃদয়ের কথা ভাবিতেও ভক্তিভরে হৃদয় অভিভূত হইয়া পড়ে!

বাঙ্গালী জাতির সৌভাগ্য এই যে, কয়েক বৎসর হইতে অনেকজন মহাপুরুষ বাঙ্গালা দেশে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছেন এবং মাঝে মাঝে তাঁহাদের পদধূলিতে এ দেশকে পবিত্র করিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ব্রজদেহী রামদাস কাঠিয়া বাবা একজন প্রধান মহাপুরুষ। শত শত সু-শিক্ষিত বাঙ্গালা-ধর্ম্মার্থী তাঁহার শ্রীচরণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন।

পরিচয়।

রামদাস কাঠিয়া বাবা শ্রীসনকাদি প্রবর্ত্তিত নিম্বার্ক সম্প্রদায় ভুক্ত অবধূত ছিলেন। এ সম্প্রদায় রাধাকৃষ্ণ যুগলরূপের উপাসক।

কেংড়া ভেলীর সন্নিকটে জ্বালামুখী নামক পিঠস্থানে ব্রাহ্মণ বংশে রামদাস জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পিতার অনেক পুত্রের মধ্যে এক পুত্র। তাঁহাদের সংসারের অবস্থা স্বচ্ছল ছিল।

কোন্ সনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। কেহ বয়সের কথা তুলিলে তিনি বাজে কথা বলিয়া সে কথা কাটিয়া দিতেন। শ্রীবৃন্দাবনের আশী-বৎসর-বয়স্ক বৃদ্ধেরাও বলিত যে, বাবাকে তাঁহারা এইরূপই দেখিতেছে। কাঠিয়া বাবা বাল্যকাল হইতে কঠোর হঠ-যোগ অভ্যাস করিয়াছিলেন, তাঁহার সুগঠিত শরীর সে তপস্যার ও যৌবন-পুণ্যের স্পষ্ট পরিচয় প্রদান করিত। বোধ হয় তাঁহার বয়স অনেক হইয়াছিল বলিয়াই তিনি বয়সের কথা বলিতেন না, কেন না সেটা একটা বুজরুকীর কারণ হইয়া উঠিতে পারিত; তিনি বুজরুকী পছন্দ করিতেন না।

সাধুসঙ্গ লাভ।

আট দশ বৎসর বয়সের সময় রামদাস রাখাল-বালকদিগের সঙ্গে মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। সময় সময় যে সকল পথশ্রান্ত সাধুগণ বৃক্ষতলে বসিয়া বিশ্রাম লাভ করিতেন, বালক রামদাস ঘর হইতে নানা প্রকারের খাদ্য আনিয়া তাঁহাদের সেবা করিতেন। এই কার্য্যে তাঁহার বড়ই আনন্দ হইত। এজন্য পিতা মাতা ও পরিজনগণের অগোচরেও তিনি ঘর হইতে নানা বস্তু আনিয়া সাধু সেবায় লাগাইতেন।



ব্রজবিদেহী মহাত্মা রামদাস কাঠিয়া বাবা।

Emerald Etg. Works, Calcutta

এক দিন একটী সাধুকে রামদাস জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, কিছু খাবে ?" তিনি বলিলেন, "তোর যা ইচ্ছে নিয়ে আয়।" বালক গোপনে ঘর হইতে বিবিধ খাদ্য বস্তু লইয়া প্রাণ খুলিয়া সাধুকে খাওয়াইলেন। বালকের ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হইয়া সেই সাধু, প্রাণ ভরিয়া এই আশীর্ব্বাদ করিলেন, "তোম্ যোগিরাজ হো যায়েগা," অর্থাৎ তুমি যোগিরাজ হইবে।

এই আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইয়া বালক রামদাস আনন্দে অধীর হইয়া পড়িলেন, উল্লাসে তাঁহার প্রাণ নাচিয়া উঠিল। কোন সু-দরিদ্র ব্যক্তি, রাজ্যেশ্বর হওয়ার আশা পাইলে যেরূপ আনন্দে উন্মত্ত হয়, "যোগিরাজ" হওয়ার আশায় বালক-রামদাসের হৃদয় তদপেক্ষা উন্মত্ত হইয়া উঠিল। তিনি যাহাকে কাছে পান তাহাকেই বলেন, "হাম্ ত যোগিরাজ হোগা।" সাধুর আশীর্ব্বাদ তাঁহার এমনই পছন্দ হইল যে, সে আশীর্ব্বাদের সফলতা সম্বন্ধে তাঁহার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ রহিল না।

এক দিন মাকে বলিলেন যে, তিনিত যোগিরাজ হবেন, সুতরাং গৃহধর্ম্ম তাঁহার দ্বারা রক্ষা পাইবে না; তাঁহারা যেন তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতাদিগকে বিবাহ করাইয়া সংসার রক্ষা করেন। "হাম্ ত যোগিরাজ হো যায়েগা" এই কথা বলিতে বলিতে সর্ব্বগাত্রে স্ফূর্ত্তির লক্ষণ প্রকাশিত হওয়ায় রামদাস অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিতেন।

উপনয়ন ও গুরুলাভ।

উপনয়নের পরে প্রগাঢ় ভক্তি ও অভিনিবেশের সহিত গায়ত্রী-মন্ত্র যপ করিতে লাগিলেন এবং একদিন একদল সাধুর সঙ্গে গৃহ হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। যিনি "যোগিরাজ" হইবেন সংসারের কোন্ বন্ধন তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে? যোগিরাজ হওয়ার

প্রলোভন ভিন্ন অন্য কোন প্রলোভনই তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে পারে নাই।

কাশীক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া তিনি বিদ্যা উপার্জ্জনে মনোযোগী হইলেন, কেননা, শাস্ত্রপাঠ ধর্ম্ম-সাধনার একটী বিশেষ অঙ্গ। নিবিষ্ট মনে উপযুক্ত আচার্য্যের নিকট বিদ্যাভ্যাস করিলেন; কিন্তু গায়ত্রী মন্ত্র যপের দিকেই তাঁহার মনের গতি ও প্রাণের টান প্রবল ছিল।

এই অবস্থায় একদিন স্বপ্নে দেখিলেন গায়ত্রী দেবী তাঁহাকে আদেশ করিতেছেন যে, আর এত লক্ষ নাম যপ করিলে তিনি (গায়ত্রী) তাঁহাকে প্রত্যক্ষ হইয়া দর্শন দিবেন। তিনি সেই পরিমিত-সংখ্যক নাম যপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

কিছুদিন পরে রামদাস ভূপালরাজ্যে এক সরোবরের তীরে একটী সাধুর দর্শন পাইলেন। তাঁহার নাম শ্রীস্বামী দেবদাসজী, তিনি মহা-পুরুষ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। রামদাস তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। দীক্ষা গ্রহণের তৃতীয় দিবসে তিনি গায়ত্রী-মূর্ত্তির সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন। যদিও তখনও তাঁহার যপসংখ্যা সম্পূর্ণ হয় নাই, কিন্তু গুরু কৃপা প্রাপ্ত হওয়ায় সেই অবস্থায়ই তাঁহার গায়ত্রী-দর্শন হইল।*

গায়ত্রীদেবী মূর্ত্তিমতী হইয়া সাক্ষাৎ দর্শন দিলেন এবং রামদাসকে বর দিতে চাহিলেন। রামদাস তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বলিলেন, "আমার সদ্‌গুরু লাভ হইয়াছে, সুতরাং আমার আর কিছুই প্রার্থনীয় নাই, আপনাকে আমি দণ্ডবৎ প্রণাম করি।"

---

* মহাপুরুষ জন (John the Baptist) যখন যিশু খ্রীষ্টকে দীক্ষা প্রদান করিলেন তখনই যিশুর নিকট স্বর্গরাজ্য প্রকাশিত হইল।

দয়াল গুরু।

কাঠিয়াবাবা বলিতেন যে, তাঁহার গুরু বড়ই দয়াল ছিলেন। গুরু তাঁহাকে আদর করিয়া ডাকিতেন না, গালাগালি না দিয়া কথা বলিতেন না, 'চামার' 'মেথর' প্রভৃতি সম্বোধন করিতেন। কোমরে এমন কাঠের কৌপিন বাঁধিয়া দিয়াছিলেন যে, শুইতে গেলে বড়ই লাগিত। তিন হাত একখানা কাপড় দিয়াছিলেন উহা তিনি মাজায় জড়াইতেন। শীতের সময় ধুনির কাছে পড়িয়া থাকিতেন। আহার সম্বন্ধেও গুরুদেব অত্যন্ত দয়া প্রকাশ করিতেন, অনেক সময় অর্দ্ধাশনে ও অনশনে রাখিতেন, মাঝে মাঝে যখন তখন প্রহারও করিতেন। এই সকল কথা বলিতে বলিতে কাঠিয়াবাবা গুরুপ্রেমে অধীর হইয়া পড়িতেন, কথায় কথায়ই বলিতেন, "গুরু বড়ই দয়াল থে।"

কঠোর শাসন সহ্য করিতে না পারিয়া গুরুজীর অনেক শিষ্য সরিয়া পড়িল। রামদাস, গুরুদেবের সকল ব্যবহারের মধ্যেই তাঁহার দয়া দেখিতে ছিলেন; কিন্তু এক দিন বড়ই বিষম ঘটনা ঘটিল। গুরুদেব শিষ্যের জটা ধরিয়া এমন করিয়া টানিয়া দিলেন যে, শিষ্যের প্রাণ কণ্ঠাগত হইল, ইহার উপর অত্যন্ত প্রহার করিলেন। গুরুভক্ত রামদাসের ধৈর্য্যের বাঁধ আজ ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি একখানা ছুরী হাতে করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গুরুদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "এই ছুরিখানা লও এবং ইহার দ্বারা আমার গলা কাটিয়া ফেল। আমি মা বাপ, ভাই বন্ধু, ঘর গৃহস্থী, সমস্ত ছাড়িয়া একমাত্র তোমাকে আশ্রয় করিয়াছি, তুমি ছাড়া আমার আর কে আছে? তুমি যদি এই ইচ্ছা করিয়া থাক যে, আমাকে তোমার কাছে থাকিতে দিবে না, তবে আমার আর জীবন-ধারণের প্রয়োজন নাই; তুমি নিজের হাতে আমার গলা কাটিয়া দাও, তোমার

হাতে মৃত্যু আমার বাঞ্ছনীয়। এত কষ্ট সহ্য করিয়া আমি বাঁচিব না এবং তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া আমি অন্যত্রও যাইতে পারিব না সুতরাং মৃত্যু ভিন্ন আমার অন্য পথ নাই, তুমিই আমার গলা কাটিয়া ফেল।”

শিষ্যের অবস্থা দেখিয়া ও কথা শুনিয়া আজ গুরুদেব প্রসন্নমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। আজ রামদাস কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। গুরুদেব প্রিয় শিষ্যকে বলিলেন, “তুমি সাধু হইতে যাইতেছ, সকল প্রকারের দুঃখ দুর্দ্দশা ও অপমানের মধ্য দিয়া তোমাকে প্রস্তুত করা আমার কর্ত্তব্য। কত লোক তোমাকে ঘৃণা করিবে, নিন্দা করিবে, ভণ্ড ও চামার বলিবে, হয়ত প্রহারও করিবে, তখন হয়ত রাগ করিয়া তুমি অভিসম্পাত করিবে কি মারামারিই করিবে। তাই তোমাকে আমি সমস্ত দুঃখ ও অপমান সহাইয়া লইলাম। আজ তোমার পরীক্ষার শেষ হইয়াছে। উঠ বৎস, আর কাঁদিও না, আমি তোমার প্রতি সম্পূর্ণ প্রসন্ন হইয়াছি, এবং তোমাকে তিনটী বর প্রদান করিতেছি—

১ম—তোমার কখনও খাদ্যবস্তুর অভাব হইবে না।

২য়—সমস্ত শাস্ত্র তোমার মধ্যে স্ফূর্ত্তি পাইবে

৩য়—তোমার ভগবৎ সাক্ষাৎকার লাভ হইবে।

গুরুদেব যেমন রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন, চেলাটীও তেমনই প্রখর প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন, সকল প্রকার কঠোর ব্যবহারের মধ্যেই তিনি গুরুর প্রসন্ন-মূর্ত্তি-দেখিতে পাইয়াছেন। উপনিষদের ঋষিরা রুদ্রের দক্ষিণমুখ দেখিয়াছিলেন, রামদাসও রুদ্রমূর্ত্তির দক্ষিণ-মুখ দেখিয়াছেন। প্রত্যেক অত্যাচারের কথা বলিতে “গুরু বড় দয়াল থে” বলিয়া তিনি গুরুপ্রেমে অভিভূত হইয়া পড়িতেন।

রামদাস যেমন তেমন চেলা নহেন, তিনিও গুরুকে প্রথম প্রথম পরীক্ষা করিয়া লইয়াছেন।

একদিন দুগ্ধ জ্বাল দিতে গিয়া কড়াটা উল্‌টাইয়া ফেলিয়া দিয়া গুরুকে বলিলেন, 'দুধ পড়িয়া গিয়াছে'। একটা বিশ্রী গালি দিয়া গুরু বলিলেন, "হাম্ কো পরীক্ষা কর্‌তা হায়?"-- আমাকে পরীক্ষা কচ্ছিস্?

একদিন গুরু শিষ্যকে জলখাবার ও গাঁজা আনিতে আদেশ করিলেন। শিষ্য বলিলেন, "টাকা কোথায়?" গুরু বলিলেন, কমণ্ডলু হাতে করিয়া বাহির হও, টাকা জুটিয়া যাইবে।" রামদাস গুরুর আজ্ঞায় কমণ্ডলু লইয়া বাহির হইলেন। তাঁহার মনোহর মূর্ত্তি দেখিয়া এক দোকানদার তাঁহাকে ডাকিয়া তাঁহার কমণ্ডলুতে কয়েক টাকা ফেলিয়া দিল। রামদাস ক্ষুধিত হইয়াছিলেন, গুরুর জন্য খাবার কিনিয়া তাহা হইতে কিছু তুলিয়া নিয়া আপনি খাইলেন। যখন গুরুর আশ্রমে উপস্থিত হইলেন, তখন গুরু বলিলেন, "চেলা এয়সাই হোনা চাহি, যো গুরুকো আগাড়ী প্রসাদী কর্‌কে লে আতা হায়"-- অর্থাৎ চেলা এমনই হওয়া চাই, যে চেলা গুরুর কাছে খাদ্য বস্তু প্রসাদ ক'রে নিয়ে আসে। রামদাস বুঝিলেন যে, গুরুজী দূর হইতে সকল দেখিতে পান। রামদা তখন দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

রামদাস গুরুদেবকে ছাড়িয়া এখন আর কোথাও যাইতেন না কিন্তু একদিন গুরুদেব বিশেষভাবে আদেশ করিয়া তাঁহাকে পদব্রজে ৺দ্বারকা-ধাম পর্য্যটনের জন্য পাঠাইয়া দিলেন। এই দীর্ঘ-পর্য্যটনের পর তিনি যখন গুরু দর্শনের পূর্ণ আশা প্রাণে লইয়া প্রত্যাগমন করিলেন, তখন আসিয়া জানিলেন, স্বামী শ্রীদেবদাসজী মায়িক দেহ পরিত্যাগ করিয়া ইহলোক হইতে চলিয়া গিয়াছেন।

নিদারুণ শোকে অধীর হইয়া কাঠিয়া বাবা কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার নিজের মাথার জটা ছিঁড়িতে লাগিলেন এবং কিছুক্ষণ পরেই মুর্চ্ছিত

হইয়া পড়িলেন। মূর্চ্ছা ভঙ্গের পরেও তিনি দীর্ঘকাল সেই খানেই হত্যা দিয়া পড়িয়া রহিলেন। পান ভোজন কিছুই করিলেন না। তাঁহার চক্ষের জলে ধরা ভিজিয়া গেল। কত লোক কত অনুরোধ করিল, কত প্রবোধ দিতে লাগিল, "এরূপ ভাবে আত্মহত্যা করা অধর্ম্ম, উঠ, খাও, কেন আত্মঘাতী হইতেছ"—এইরূপ কত কথা কয়েক দিন কত লোক বলিল, তিনি কাহারও কথায় কর্ণপাত করিলেন না। অবশেষে একদিন দেখিলেন, গুরুদেব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হইয়া হাত ধরিয়া তাঁহাকে টানিয়া তুলিলেন এবং বলিলেন, "এই দেখ আমি রয়েছি, গুরু কি কখন মরে? এই দেখ আমি সাক্ষাতে আছি তোমার কোন চিন্তা নাই। বিপদে আপদে তুমি আমার সাক্ষাৎ পাইবে" কাঠিয়াবাবা বলিয়াছেন যে তিনি গুরুদেবের শরীর স্পর্শ করিয়া টিপিয়া দেখিয়াছেন। পিটার প্রভৃতি শিষ্যগণ যিশুকে এইরূপ দেখিয়াছিলেন।

প্রত্যক্ষ গুরুমূর্ত্তি দর্শন করিয়া এবং তাঁহার শ্রীমুখের বাণী শুনিয়া রামদাসের চিত্ত প্রসন্ন হইল, তিনি স্বস্থভাবে উঠিয়া আহারাদি করিলেন। এই ঘটনা নর্ম্মদার তীরে জব্বলপুরের নিকটে ঘটিয়াছিল।

ইহার পরে ভরতপুরে "নয়লানী" নামক কুণ্ডের কাছে তিনি সিদ্ধিলাভ করেন, এইখানে তাঁহার ভগবদ্দর্শন হয়। এ বিষয় তিনি নিজে একটি হিন্দি কবিতায় নিজের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন,—

"রামদাসকো রাম মিলা নয়লানীকা কুণ্ড।
সাধুজন্ তো সাঁচ্চা মানে ঝুটা মানে গুণ্ডা॥"

ইহার অর্থ এই যে, নয়লানী কুণ্ডের কাছে রামদাসের রাম মিলিয়াছে; সাধু লোকেরা এ কথা ঠিক বলিয়াই মানিবে, কিন্তু গুণ্ডা-লোকেরা (পাষণ্ডেরা) ইহা বিশ্বাস করিতে পারে না।

তীর্থ পর্য্যটন।

হিমালয়ের বিবিধ স্থানে ভ্রমণ করিয়া দেব-প্রয়াগে কাঠিয়াবাবা কিছু দিন অবস্থিত করিয়াছিলেন। সেখানে অনেক সাধু-সন্ন্যাসী থাকেন, কন্দমূলই তাঁহাদের প্রধান খাদ্য। কন্দমূল দেখিতে সরদার মতন, উহা পোড়াইলে ভিতরের বস্তুটী মোহনভোগের মতন নরম ও সুখাদ্য হয়। বর্ষাকালে কন্দমূল পাওয়া যায় না, এই জন্য হেমন্তে সাধুরা কন্দমূল সংগ্রহ করিয়া রাখার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন। রামদাস দেখিলেন, ইহাও ত একপ্রকার সাংসারিকতা, তবে এখানে থাকিলে লাভ কি? আহারের জন্য যদি ব্যস্ত থাকিতে হইল, তবে ত সংসারে থাকাই ভাল, নির্জ্জনে থাকায় ফল কি?

দেব-প্রয়াগ ছাড়িয়া তিনি মথুরা মণ্ডলে আসিয়া বৃন্দাবনে বাস করি-লেন। বৃন্দাবনে আসিয়া শুনিলেন যে, "নিকুঞ্জকাননে" অদ্যাবধি রাধা-কৃষ্ণ নিত্যলীলা করিয়া থাকেন। শাস্ত্রেও আছে,—

"বৃন্দাবনে মুকুন্দস্য নিত্যলীলা বিরাজতে।"

"নিকুঞ্জকাননে" নাকি এখনও কেহ রাত্রিবাস করে না, দিনে সেখানে লোকারণ্য হয় কিন্তু সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সকলে সে স্থান ছাড়িয়া পলায়ন করে। শুনিতে পাই দিবাভাগে সেখানে শত শত বানর চারিদিকে লাফালাফি করিয়া বেড়ায় কিন্ত সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সকলে সে স্থান ছাড়িয়া প্রস্থান করে। প্রবাদ আছে, যদি কোন ব্যক্তি সেখানে রাত্রি বাস করে তবে তাহার মৃত্যু হয়, যদি মৃত্যু নাও হয় তবে সে ব্যক্তি অন্ধ, বধির কিম্বা পাগল হইয়া যাইবে। কিন্তু যাঁহারা বিশেষ তপোবলসম্পন্ন, তাঁহাদের কিছু হয় না।

কাঠিয়া বাবা রাত্রি দিন নিকুঞ্জকাননে পড়িয়া থাকিয়া যপ ও ধ্যানে ৬ মাস কাটাইলেন। একদিন দেখিলেন, অপূর্ব্ব বেশে সখিবেষ্টিতা

শ্রীমতী ও শ্রীকৃষ্ণ সেখানে প্রকাশিত হইলেন, সখীরা নৃত্যগীত করিতে লাগিলেন এবং নিকুঞ্জলীলা প্রকটিত হইল।

সাধুর স্বভাব।

যিনি সমস্ত ইন্দ্রিয় ও মনোবৃত্তিকে স্ব-বশে আনিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত সাধু। ইন্দ্রিয় ও প্রবৃত্তিগুলি তাঁহার হাতে বাজিকরের পুতুলের মতন নৃত্য করে। একজন সঙ্গীতজ্ঞ লোক যেমন যখন তখন সুরের যে কোন গ্রাম কণ্ঠ হইতে বাহির করিতে পারেন, সাধুরাও সেইরূপ যে কোন ভাবকে যখন তখন প্রকাশ করিতে এবং পরক্ষণেই উহার সংহার করিতে পারেন। এই ভাবটী বুঝিয়া উঠা একটু শক্ত কথা। বিশেষতঃ যাহারা এ ভাব কখনও দেখে নাই, তাহারা ঠিক বিপরীত বুঝিয়া থাকে। ক্রোধ করার দরকার হইয়াছে, সাধু তখন রাগের সুরটা সপ্তমে চড়াইয়া একে বারে ছাড়িয়া দিলেন, আবার বিরুদ্ধ প্রয়োজন হওয়া মাত্র অমনি উহা বন্ধ করিয়া দিলেন। ইন্দ্রিয় ও মনোবৃত্তিগুলি তাঁহারই হাতের পুতুল, তিনি তাহাদের অধীন নহেন। সেতার-বাদক যেমন ইচ্ছামাত্র তাহার অঙ্গুলী-তাড়নায় নরম গরম যে কোন সুর বাজাইয়া যায়, কখন ষড়জে, কখন পঞ্চমে, কখনও বা ধৈবতে ঝঙ্কার দেয়, সাধনসিদ্ধ ব্যক্তি সেইরূপ আপন ইচ্ছামত মনোবৃত্তিগুলিকে ইঙ্গিতে পরিচালিত করেন। রিপু-দমনের অনেক পরে এই অবস্থা লাভ হয়, ইহা অতি উচ্চ অবস্থা। সাপকে ঝাঁপিতে বন্ধ করিয়া রাখা আর বিষধর সর্প লইয়া খেলা করা এই দুইটি কার্য্যের মধ্যে যত প্রভেদ, রিপু-দমন করা আর রিপুকে বশীভূত করা এই দুই সাধনার মধ্যেও সেইরূপ প্রভেদ। অসিদ্ধ ব্যক্তিরা এই খেলা খেলিতে গেলে সর্পাঘাতে তাঁহাদের মৃত্যু ঘটে। যে ব্যক্তি যখন তখন যে কোন প্রবৃত্তির উদ্রেক করিতে এবং যখন তখন তাহাকে

থামাইতে পারেন. তিনিই প্রকৃত খেলোয়ার। যাহারা কোন সাধুকে কোন কারণে রাগ করিতে দেখিয়া মনে করে, এ আবার কেমন সাধু, তাহারা কখনই এ দেশের সাধুদিগকে চিনিতে পারিবে না।

কাঠিয়া বাবার আশ্রমের পূজারী ও ভৃত্যগণ একদিন কর্ত্তব্য কার্য্যে বিশেষ ত্রুটি করায় তিনি তাহাদিগকে যা খুসী তাই' বলিয়া গালাগালি করিলেন। সে গালাগালিতে কোন প্রকারের সঙ্কোচ অথবা সভ্যতার আবরণ ছিল না। গালাগালি করিব অথচ শিষ্ট-শব্দ প্রয়োগ করিব নতুবা অসভ্যতা হইবে, এ ভাবটা সাধুদের মধ্যে বড় দেখা যায় না। তাঁহাদের গালাগালি শুনিতেও অতি মধুর লাগে, তাহাতে বিদ্বেষ বা কপটতার নাম-গন্ধ নাই। অত্যন্ত গালাগালি খাইয়া পূজারী ও ভৃত্য বলিল, "বাবা, আর গালি দিও না, আমাদিগকে বিদায় করিয়া দাও, আমরা চলিয়া যাইতেছি।" তৎক্ষণাৎ কাঠিয়া বাবা বলিলেন, "তোমরা চলিয়া যাইবে? আশ্রম কি আমার একলার? এখানে তোমরাও যা, আমিও তাই, কর্ত্তব্য-কার্য্য কর নাই বলিয়া গালি দিয়াছি, তাহা সহ্য করিতে পারিতেছ না, তবে তোমরাই এখানে থাক, আমিই চলিলাম।" এই কথা বলিয়াই বাবাজী কমণ্ডলুটী হাতে লইয়া আশ্রম হইতে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া পড়িলেন। তখন সেই পূজারী ও ভৃত্য দৌড়াইয়া গিয়া বাবাজীর পায়ে পড়িয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিল এবং বলিল, "বাবা, তুমি হাজার গালা-গালি দিলেও আমরা আর কথা বলিব না।" বাবাজী হাস্যমুখে তাহাদের সঙ্গে ফিরিলেন, ঠিক যেন বালকের গোসা-গোসী হইয়া গেল।

বৃন্দাবনে ছন্নু বাবু নামে একজন ধনী লোক আছেন, তিনি একজন অতি সম্ভ্রান্ত ব্রজবাসী। কাঠিয়া বাবার আশ্রমে তাঁহার সর্ব্বদা যাতায়াত ছিল, বাবা তাঁহাকে ভালবাসিতেন। একদিন বাবাজী কি অপরাধের জন্য একটী লোককে খুব গালাগালি করিতেছেন, ছন্নু বাবু মাঝখানে

পড়িয়া কিছু বলিয়া যেন মীমাংসা করিতেছিলেন। বাবাজী তাঁহাকে তীব্র-ভাষায় বলিলেন, "তুমি কেন কথা বলিতেছ? তোমাকে আমার ভাল লাগিতেছে না।" এতগুলি লোকের সম্মুখে তিরস্কৃত হইয়া ছন্নু বাবু আপনাকে বড়ই অপমানিত বোধ করিলেন; তিনি মর্ম্মাহত হইয়া বলিলেন, "বাবা, তুমি যদি আমার উপর নারাজ হও, তবে আমি দণ্ডবৎ করিয়া যাইতেছি, আর এখানে আসিব না।" বাবাজী তৎক্ষণাৎ আসন হইতে উঠিয়া ছন্নু বাবুর কোলে বসিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া আদর করিয়া বলিলেন, "ছন্নু, তোমরা যদি আমায় ছে'ড়ে যাবে তবে আমি কাকে নিয়ে থাকবো?" বলা বাহুল্য যে ছন্নু বাবু চক্ষের জল ফেলিয়া বাবাজীর চরণ স্পর্শ করিলেন, অপমানের উত্তাপে যে শরীর উত্তপ্ত হইয়াছিল, বাবাজীর স্পর্শে তাহা শীতল হইয়া গেল। প্রচণ্ড দীপকের পরে সুমধুর ভঁয়রো বাজিয়া উঠিল!

একদিন একজন নব্য-শিক্ষাভিমানী বাঙ্গালী, কাঠিয়া বাবার সহিত ধর্ম্মালোচনা করিতে গিয়াছিলেন। বাবুটীর ভিতরে জ্ঞানের গরিমা ছিল। এই শ্রেণীর লোকেরা যখন কোন সাধু দর্শন করিতে যায়, তখন সাধুর নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করাই তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য থাকে না, কথা-প্রসঙ্গে নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দেওয়াও একটী বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে। কথাবার্ত্তা শুনিয়া সাধু যদি তাহার প্রশংসা করেন তবে সঙ্গীয় লোকদিগের মুখের দিকে তাকাইয়া ইঙ্গিতে প্রকাশ করে যে, "সাধু একজন সিদ্ধ-পুরুষ"। আর সাধু যদি তাহার অহঙ্কারের মাথায় আঘাত করেন তবে শুষ্ক প্রণাম করিয়া উঠিয়া যায় এবং অন্তরালে যাইয়া বলে যে, "এ সাধু সুধু ভেকধারী, সাধুর পোষাক পরিলেই কি সাধু হয়? বস্তুতঃ এই শ্রেণীর লোকেরা পিপাসু নয়, জিজ্ঞাসুও নয়। উপরোক্ত বাবুটী বোধ হয় এই শ্রেণীর লোক ছিলেন।

ব্রহ্মজ্ঞানের কথাবার্ত্তা বলিয়া বাবুটী যোগশাস্ত্রের কথা তুলিলেন। ষড়চক্র-ভেদের কথা বলিয়া পরিশেষে বলিলেন যে গঙ্গা যমুনা সরস্বতী ইহারা ত আমাদের অন্তরেই আছে, তবে বাহ্য-স্নানাদির প্রয়োজন কি? বাবাজী এতক্ষণে মুখ তুলিয়া বলিলেন, "বাবু সাহেব, আমি আপনার নিকট একটা নিবেদন করিতেছি। আপনাকে আমি একটি ঘরের মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিব, যখন আপনার পিপাসা লাগিবে তখন বলিব, মহাশয় আপনার মধ্যে গঙ্গা যমুনা সরস্বতী রহিয়াছে, আপনি সচ্ছন্দে তাহা দ্বারা স্নান ও পান কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন। এ অবস্থায় কি আপনার পিপাসা নিবারণ হইবে?"

বাবুটী অবশ্যই এরূপ প্রশ্নে তৃপ্ত হইলেন না, নমস্কার করিয়া চলিয়া গেলেন; তখন পার্শ্বস্থ অন্য একজন বাঙ্গালীকে কাঠিয়া বাবা বলিলেন, "তোম্‌হারা মুল্লুকমে ছাপাকা জ্ঞান বহুত হায়।" অর্থাৎ তোমাদের দেশে পুঁথিপড়া জ্ঞানের অভাব নাই।

একথা মিথ্যা নয় যে অনেক শিক্ষিত বাঙ্গালী কতকগুলি তত্ত্বকথা মুখস্থ করিয়া মনে করেন যে, তাঁহাদের তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়াছে; কিন্তু যখন পিপাসায় কাতর হন তখন সেই তত্ত্বগত গঙ্গা যমুনা সরস্বতী এক বিন্দু জল দিয়া পিপাসা মিটাইতে পারে না। তত্ত্বলাভের প্রণালী না জানিয়া তত্ত্বকথাগুলি মুখস্থ করিয়া রাখিলে কখনও ধর্ম্ম হয় না।

অভ্যাগত বা জমাৎ।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বহুসংখ্যক সাধু নানা তীর্থযাত্রা ব্যপদেশে কিম্বা সাগরসঙ্গমে যাওয়ার জন্য এক একটী দল করিয়া যাত্রা করেন, প্রত্যেক দলে ৩।৪ শত মূর্ত্তি জোয়ান থাকে। এইরূপ দলকে 'অভ্যাগত' বা 'জমাৎ'

বলে। একজন সদাচারসম্পন্ন তীক্ষ্ণবুদ্ধিশাস্ত্রজ্ঞ প্রতিভাশালী এবং শাসন-পালন-সক্ষম অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন পবিত্রচরিত্র মহাপুরুষকে এই দলের মহান্ত বা নেতা বরণ করা হইয়া থাকে। যতদিন পর্য্যন্ত জমাৎ থাকিবে ততদিন দলের প্রত্যেক ব্যক্তিকে নেতার বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিতে হইবে। নেতা নির্ব্বাচন করিতে কোন প্রকার বিবাদ বিসম্বাদ অথবা মতান্তর মনান্তর ঘটে না। কাঠিয়া বাবা একবার এরূপ এক জমাতে মহান্ত হইয়াছিলেন। জমাতের নিয়ম এই যে, বিশেষ কারণ ভিন্ন সাধুরা আপন আপন আসন ছাড়িয়া উঠিবে না, ভিক্ষা কাহারও নিকট কিছু চাহিবে না, গৃহস্থের দ্বারস্থ হইবে না, লোকে ইচ্ছাপূর্ব্বক যাহা দিবে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবে; কিন্তু এ নিয়ম জমাতের সকলেই যে রক্ষা করিতে পারে তাহা নহে। অনেক ক্ষুদ্রশক্তি সাধু গোপনে গোপনে এই নিয়ম ভঙ্গ করিয়া থাকে মহান্ত জানিতে পারিলে নিয়মভঙ্গকারীদিগকে শাস্তি পাইতে হয়। সে শাস্তি বড় সহজ শাস্তি নহে।

কাঠিয়া বাবার জমাতে একদিন আহার জুটিল না। ২।১ জন দুর্ব্বল চরিত্র অসহিষ্ণু বাবাজী সন্ধ্যার পরে আহার-অন্বেষণে এদিক সেদিক চলিল; তাহা দেখিয়া একজন সন্ন্যাসী কাঠিয়া বাবাকে বলিলেন, "রামদাস, তোমার জমাতের লোকেরা সাধু নয়, ইহাদিগকে সাধু বলে না।" কাঠিয়া বাবা সসম্মানে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, সাধু কাহাকে বলে?" পরমহংস বলিলেন, "তাঁহাকেই সাধু বলে যে ব্যক্তি অনাশ্রিত ভাবে থাকিয়া যাহা আসে তাহা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকে, ভগবান্ যা পাঠাবেন, তাই পাবে, কুক্কুর-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া আহারের জন্য ঘুরিয়া বেড়াইবে না।" বাবাজী এই সন্ন্যাসীর কথাটা শুনিয়া রাখিলেন

নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইলে জমাৎ ভাঙ্গিয়া গেল। ইহার পর এক দিন কাঠিয়া বাবার সঙ্গে সেই সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ হইল। বাবাজী বিনয়

করিয়া তাহাকে বলিলেন, "মহারাজ, আমি আপনার সঙ্গে কিছুকাল থাকিয়া সাধুগিরি শিক্ষা করিব।" সন্ন্যাসী সম্মত হইলেন। দুই-জনে একত্রে এক নিভৃত স্থানে গমন করিলেন। সে স্থান হইতে সহর বেশী দূর না হইলেও সহজে সেখানে জন-সমাগমের সম্ভাবনা ছিল না। সেই বিজনে তাঁহারা আপন আপন আসন পাতিয়া বসিলেন। অনাহারে তিন দিন কাটিয়া গেল। সন্ন্যাসী ব্যস্ত হইলেন। ইহার পর আরও দুদিন কাটিল; তিনি অধীর হইয়া পড়িলেন এবং কাঠিয়া বাবাকে বলিলেন, "আমি আর সহ্য করিতে পারি না।" কাঠিয়া বাবা তাঁহাকে লইয়া নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে গেলেন এবং সেখানে উভয়ে আহার করিলেন। গ্রামের লোকেরা তাঁহাদিগকে অতি যত্নের সহিত আহার করাইল, ইহার পরে একদিন কাঠিয়া বাবা সন্ন্যাসীকে বলিলেন। "মহারাজ এই কি সাধুগিরি শিক্ষা?" সন্ন্যাসী বলিলেন—"বাবা, তুমি সমর্থী, তুমিই প্রকৃত মহান্ত, তুমি আমার গুরু।" কাঠিয়া বাবা বলিলেন, "ভগবানকে পরীক্ষা করিতে নাই, সহজভাবে চলিতে হয়। এ বিষয় গর্ব্ব খাটে না। লোকের কাছে চাহিব না—এরূপ অভিমান করিতে নাই।"

এইরূপ ভাবে কাঠিয়া বাবা কার্য্যক্ষেত্রে অনেক লোককে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। একদিন এক প্রশ্নকারী কাঠিয়া বাবাকে বহু প্রশ্ন করিলেন তিনিও সকল প্রশ্নের উত্তর দিলেন; কিন্তু সে ব্যক্তি কিছু-তেই নিরস্ত হইতেছিল না, তাঁহার প্রশ্ন আর ফুরাইতেছিল না। তখন বাবাজী বলিলেন, "শাস্ত্র পাঠ কর, সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ কর, তাহাতেও যদি না হয় তবে এজন্মে হইল না। সকলেরই কি সফল হয়? কত স্ত্রীলোকের সন্তান হয় না, কত গাছের ফল হয় না, তাহার কারণ কে বলিতে পারে?"

ব্রজবাসীর প্রতি সদ্ভাব।

একদিন একজন ব্রজবাসী কাঠিয়া বাবার সঙ্গে একাসনে বসিয়াছিলেন। একজন শিষ্য ইহাতে অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন। ব্রজবাসী চলিয়া গেলে বাবাজী শিষ্যটীকে বলিলেন, "এই রূপ করা ভাল হয় নাই, উহারা লালাজির কাঁধে চড়িয়াছেন, উঁহারা যে আমাদের সহিত একাসনে বসেন ইহাই যথেষ্ট, এঁদের কাছে আর সাধু কি? ইঁহারা লালাকে উচ্ছিষ্ট দিয়াছেন। ইঁহাদের বাহিরের আচরণ দেখিয়া বিচার করা কর্ত্তব্য নয়। ইঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা উচিত, নতুবা রাধারাণীর কৃপা হয় না"।

একদিন ব্রজবাসীরা নৃত্যগীত করিতেছিলেন, কাঠিয়া বাবা পার্শ্বস্থ একজনকে চুপি চুপি বলিলেন, "দেখ্‌ দেখ্‌ ইঁহাদের ঘরে খাবার নাই, তথাপি আনন্দে ভরপুর।"

ধর্ম্ম-মত।

কবীর পন্থীরা ব্রহ্মজ্ঞানী, কবীরের ধর্ম্ম খুব উচ্চ, কিন্তু বৈষ্ণবগণ লীলাহীণ ধর্ম্মকে শুষ্ক বলিয়া মনে করেন। কাঠিয়া-বাবা একটি দোহার দ্বারা এই বিষয়ে তাঁহার মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন—

"কবীর কবীর ক্যা কহো,
আও যমুনাকা তীর।
এক গোপীকা প্রেমছে
বয় যায় কোট্ কবীর।"

কবীর কবীর বলিয়া কি কহিতেছ? একবার যমুনার তীরে চল, দেখিবে এক এক গোপীর প্রেমে কোটী কোটী কবীর ভাসিয়া যাইতেছে। বস্তুতঃ গোপীর এক বিন্দু চক্ষের জলের সঙ্গে কোটী কোটী বৎসরের ধ্যান-ধারণার তুলনা হয় না। কাঠিয়াবাবা বলিতেন—

"বৃন্দাবন কা কুঞ্জ্ গলিমে,
মুক্তি পড়ি বিলায়।
যব্ গোরজ উড়ি মস্তকে লাগে,
সহ মুক্তি হো যায়।"

অর্থাৎ বৃন্দাবনের কুঞ্জের গলিতে মুক্তি বিলাপ করিয়া বেড়ায় (তাহাকে কেহই আদর করে না), যখন গো ধূলী (ব্রজের রজ) উড়িয়া মস্তকে লাগে, তখন সহজ-মুক্তি লাভ হয়।

"ব্রহ্মানন্দো ভবেদেষচেৎ পরার্দ্ধগুনীকৃতঃ।
নৈতি ভক্তি সুধাম্বুধেঃ পরমাণুতুলামপি।"

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

যদি ব্রহ্মানন্দ সুখকে পরার্দ্ধ সংখ্যার দ্বারা গুণ করা যায়, তাহা হইলেও ঐ ব্রহ্মানন্দ সুধা ভক্তি-সুধা-সাগরের পরমাণুর

তুল্যও হইতে পারে না। এই ভক্তির চরমবিকাশ রাধাকৃষ্ণ-লীলায় এবং লীলাস্থলের মধ্যে বৃন্দাবনই সর্ব্বোত্তম। কাঠিয়া বাবা বলিতেন—

' কর্ বৃন্দাবন বাস,
হোয় ঘটমে প্রকাশ।
কর্ সদ্‌গুরুকা আশ,
হোয়ে তিমিরকা নাশ।"

অর্থাৎ বৃন্দাবনে বাস কর, তোমার ঘটে ভগবানের প্রকাশ হইবে। সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ কর তিমির বিনষ্ট হইবে।

সাধুদিগের নিকট স্থানমাহাত্ম্য সহজেই উপলব্ধি হয়। সাধারণ লোকেরা তাহা অনুভব করিতে পারে না। একটা সহজ দৃষ্টান্ত দ্বারা এ কথা বুঝান যাইতে পারে। একজন প্রতিভাশালী কবি অথবা একজন ভাবুক চিত্রকর প্রকৃতি রাজ্যের যে সৌন্দর্য্য অবলোকন করেন, সাধারণ লোকেরা তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারে না! কিন্তু সাধকদিগের স্থান কবিদিগের অনেক উপরে, তাঁহারা সত্য সত্যই দিব্য-দৃষ্টি, দিব্য-শ্রবণ, দিব্য-ঘ্রাণ, ও দিব্য-আস্বাদন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি তাঁহাদের নিকট মধু বর্ষণ করে। একটি পাখীর সুকণ্ঠ শুনিলে তাঁহাদের শরীর শিহরিয়া উঠে, একটি প্রস্ফুটিত পুষ্পের দিকে তাকাইয়া তাঁহারা অশ্রুজলে অভিষিক্ত হন, একটু মিষ্ট সামগ্রী মুখে দিয়া মা আনন্দময়ীর আবির্ভাবে নেত্রে তাঁহাদের আনন্দ ধারা বহিতে থাকে, সমস্তই তাঁহাদিগের নিকট মধুময়

হইয়া যায়। সাধারণ লোকেরা কোন বস্তু হইতেই এই রূপ আনন্দ প্রাপ্ত হয় না। বৃন্দাবন, যমুনা, ব্রজের ধূলি প্রভৃতিতে বৈষ্ণব-ভক্তের প্রাণ কিরূপ আকৃষ্ট হয় অন্যের তাহা বুঝিবার উপায় নাই। উচ্চদরের ইংরেজি-শিক্ষিত বিচক্ষণ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিকে ব্রজের ধুলিতে গড়া-গড়ী দিতে দেখা গিয়াছে। ইনি পূর্ব্বে উপবীত

বিদ্যাশিক্ষা।

রামদাস উপনয়নের পরে গুরুগৃহে বাস করিয়া ব্যাকরণ ও জ্যোতিষ প্রভৃতি কিছু কিছু পড়িলেন। শিক্ষাগুরু তাঁহাকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন। অন্যান্য ছাত্রগণ এইজন্য রামদাসকে হিংসা করিত এবং এই বলিয়া গুরুর নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিত যে, রামদাস লেখাপড়ায় কিছুই মনোযোগ দেয় না, শুধু মালাজপ করিয়া সময় কাটায়। গুরু তাঁহাকে ডাকিয়া অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, বালক উত্তর দিলেন। গুরু বুঝিলেন যে, রামদাস অত্যন্ত মেধাবী, অল্পকাল পড়িয়াই অনায়াসে সমস্ত মুখস্থ করিতে পারে। গীতা পড়িতে আরম্ভ করিয়া রামদাসের মনে কিরূপ ভাবের সঞ্চার হইল, সে কথা তাঁহার নিজ ভাষায় বলাই সঙ্গত। তিনি বলিয়াছেন,—"গীতা যব্ হামারা পড়ানে সুরু কিয়া তব্ হামারা মন্‌মে হুয়া য্যায়সা হামারা প্রাণ ভি আয় গিয়া।" অর্থাৎ গীতা পড়িতে আরম্ভ করিয়া মনে হইল যেন আমি প্রাণ পাইলাম।

গুরুগৃহে পাঠ সমাপ্ত করিয়া রামদাস যখন গৃহে ফিরিলেন তখন অন্যান্য গ্রন্থগুলি গাঁটুরী বাঁধিয়া মাথায় লইলেন কিন্তু গীতা খানিকে বুকে করিয়া লইলেন।

মাথা এবং বুকের পার্থক্যের কথায় আজ মহাকবি ভক্তশ্রেষ্ঠ সুন্দরদাসের "সুন্দর-বিলাস" নামক সুপ্রসিদ্ধ হিন্দীগ্রন্থের একটী কবিতার অর্দ্ধাংশ মনে পড়িল।

সুন্দরদাস দাদুপন্থিসম্প্রদায়-ভুক্ত এবং গুরুদাদুর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন তিনি সমস্ত সাধুদিগের সম্মান করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে,—

"আওর তু শন্ত সবে শির উপর
সুন্দরকে উর্ হ্যায়্ গুরু দাদু।"

অন্য যত সমস্ত সাধু তাঁহারা সকলেই আমার মাথায় থাকুন, কিন্তু আমার গুরুদেব দাদু আমার বুকে আছেন।

প্রাণের বস্তুকে শুধু মাথায় রাখিলে চলিবে না, শুধু শ্রদ্ধা ভক্তি করিলে চলিবে না, তাহাকে প্রাণের মধ্যে রাখা চাই। মাথা ও বুকে ঢের প্রভেদ।

বালক রামদাস যে অন্যান্য গ্রন্থকে মাথায় রাখিয়া গীতাকে বুকে ধরিলেন, ইহাতে এই বয়সেই তাঁহার হৃদয়ের চমৎকার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। শুধু এই ক্ষুদ্র কার্য্যটীর দ্বারাই তাঁহার ভবিষ্যৎ মহিমা সূচিত হইতেছে।

যাঁহারা জগতে মহাপুরুষ বলিয়া পরিচিত, অনুসন্ধান করিলে তাঁহাদের বাল্যজীবনে এমন সকল খুঁটিনাটি ছোট ছোট কার্য্য

পাওয়া যায়, যে সকলের মধ্যে তাঁহাদের ভবিষ্যৎ মহিমার বীজ নিহিত রহিয়াছে। মূলে যাহা নাই, ফলে কখনই তাহা ফলিতে পারে না।

"বৈরাগ গ্রহণ কিয়া।"

রামদাস দীক্ষার পরে গায়ত্রী মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিবেন বলিয়া গ্রামের সন্নিকটে এক অশ্বত্থ বৃক্ষের তলায় জপ করিতে বসিলেন। এক লক্ষ জপ সমাপ্ত হইলে আকাশবাণী হইল যে জ্বালামুখী যাইয়া আর পঁচিশ হাজার জপ করিলে সিদ্ধিলাভ হইবে।

জ্বালামুখী যাইতে একটী ভ্রাতুষ্পুত্র রামদাসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া তাঁহার সঙ্গী হইল। এই যাত্রায় এক স্থানে দেখিলেন যে, একজন তেজঃপুঞ্জ পুরুষ রাস্তার কাছে বসিয়া আছেন। তাঁহাকে দেখিয়াই রামদাস বিচারশূন্য আকর্ষণে তাঁহার পায়ে পড়িয়া প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন, "মহারাজ, তুমি আমাকে তোমার চেলা কর।" মহাপুরুষ বলিলেন, "হাঁ, তোমাকে চেলা করিব।" এই সময় রামদাসের বয়স ১৮ বৎসরের অধিক নহে।

এই ঘটনায় দেখা যায় যে, গুরু যেন শিষ্যের জন্য রাস্তায় অপেক্ষা করিতেছিলেন, তিনি শিষ্যকে এমন ভাবে আকর্ষণ করিলেন যে শিষ্যের আর বিচার কিম্বা বিবেচনা করার অবসর থাকিল না।

সেই মহাপুরুষ (শ্রীস্বামী দেবদাসজী) তখনই রামদাসকে দীক্ষা ও ভেক প্রদান করিলেন। সঙ্গীয় ভ্রাতুষ্পুত্রটী দেশে

ফিরিয়া আসিয়া সকলকে সংবাদ দিল যে, "রামদাস বৈরাগ গ্রহণ কিয়া।"

"ইস্‌মে কুছ্ দোষ নেহি।"

পিতা, প্রিয়পুত্রের বৈরাগ্যের সংবাদ পাইয়া সেখানে ছুটিয়া আসিলেন, পুত্রকে অনেক বুঝাইলেন এবং রাজদ্বারে নালিশ করিবেন বলিয়া স্বামী দেবদাসকে ভয় দেখাইলেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না; পুত্র স্পষ্টই বলিলেন যে, তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক ভেক গ্রহণ করিয়াছেন, বাবাজীর কিছুমাত্র দোষ নাই; সুতরাং রাজদ্বারে অভিযোগ করিয়া কিছুই ফললাভ হইবে না। পুত্রের এই কথা শুনিয়া পিতা অত্যন্ত বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন।

রামদাসের পিতাকে অত্যন্ত কাতর দেখিয়া দেবদাসজী তাঁহার নবীন শিষ্যকে বলিলেন,—"আচ্ছা যাও, তোম্ জনম-স্থান কো চেতাও" অর্থাৎ তুমি তোমার জন্মস্থানে যাইয়া সে স্থানকে জাগ্রত কর।

এস্থলে একটী কথা এই যে, সন্ন্যাসী কি বৈরাগী হইলে তাঁহাকে জন্মস্থানে যাইতে নাই, নিজ বংশের ও পিতামাতার পরিচয় দিতে নাই, কিন্তু এস্থলে কাঠিয়া বাবার গুরুদেব কেন তাঁহাকে জন্মস্থানে যাইতে বলিলেন? ইহার উত্তর, তিনি নিজেই দিয়াছেন। তিনি বলিলেন যে, তুমি যখন সন্ন্যাসী হইয়াছ

তখন তোমার আর স্বদেশ বিদেশ, আত্মপর কি আছে? অর্থাৎ স্বদেশে যাইব না এরূপ সঙ্কল্প থাকিলে সেই সঙ্গে সঙ্গে ভেদজ্ঞান বদ্ধমূল থাকিয়া গেল। নিম্নাধিকারীর পক্ষেই এরূপ নিয়মের প্রয়োজন কিন্তু উচ্চাধিকারীর জন্য স্বদেশ বিদেশ কিছুই নহে। এইজন্যই কাঠিয়া বাবার গুরু তাঁহাকে স্বদেশে যাইতে বলিয়া বলিলেন "ইস্‌মে কুছ্ দোষ নেহি।"

নিমন্ত্রণ-রক্ষা।

রামদাস দেশে ফিরিলেন বটে কিন্তু নিজের বাড়ীতে রহিলেন না। যে অশ্বত্থ বৃক্ষের তলায় তিনি গায়ত্রীমন্ত্র জপ করিতে বসিয়াছিলেন, সেই বৃক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। দলে দলে গ্রামের লোক স্ত্রীলোক পুরুষ তাঁহাকে দেখিতে আসিতে লাগিল। শ্বেত-করভক-কান্তি, সুস্থদেহ নবীন-সন্ন্যাসী সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন। গ্রামের লোকেরা সকলেই তাঁহাকে আপন বাড়ীতে লইয়া গিয়া আহার করাইতে ইচ্ছুক, এইজন্য এইরূপ বন্দোবস্ত হইল যে, তিনি এক এক দিন এক এক বাড়ী যাইয়া ভিক্ষা (আহার) করিবেন। মাতার নিমন্ত্রণ তিনি প্রথমতঃ অস্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু মা অত্যন্ত রোদন করায় পরিশেষে স্বীকার করিলেন। যে ভাবে অন্যান্য সকলের বাড়ী যাইতেছেন সেই ভাবে মাতার বাড়ীতে যাইবেন তাহাতে আর দোষ কি? যে দিন মাতৃ-নিমন্ত্রণ-রক্ষার জন্য রামদাস

নিজের পৈত্রিক বাটীতে পদার্পণ করিলেন, সেদিন পরিবারবর্গ ও সমাগত আত্মীয়স্বজনগণের মধ্যে কান্নার রোল পড়িয়া গিয়াছিল। যাঁহারা জীবন্ত আত্মীয়কে জন্মের মতন হারাইয়াছেন, তাঁহাদের দুঃখের পরিসীমা কোথায়? সন্ন্যাস-ধর্ম্ম এমনই কঠিন যে এই ধর্ম্মে নিজ বাস-ভবনে পিতামাতার প্রদত্ত অন্ন-গ্রহণের নাম ভিক্ষাগ্রহণ বা "নিমন্ত্রণ রক্ষা।"

প্রেতিণীর উৎপাৎ।

অশ্বথ বৃক্ষতলে অনেক নরনারী রামদাসকে দেখিতে এবং তাঁহার সঙ্গে সদালাপ করিতে আসিত; এই সুযোগে একটী যুবতী কিছু বেশী আনাগোনা করিতে লাগিল। রামদাস গ্রাম্য-সম্পর্কে এই স্ত্রীলোকটীর দেবর হইতেন, সুতরাং এই রসিকা সেই সম্পর্ক ধরিয়া তাঁহার সঙ্গে অসঙ্কোচে কথাবার্ত্তা বলিত। কিন্তু ইহার আচরণ ও ভাবভঙ্গি দেখিয়া আবাল-ব্রহ্মচারী রামদাসের মনে সন্দেহের উদয় হইল, ইহার সঙ্গ তাঁহার ভাল লাগিতেছিল না। এই স্ত্রীলোকটী প্রায়শঃ সন্ধ্যার সময় রামদাসের নিকট আসিত, তখন অন্য লোক বড় থাকিত না। একদিন রামদাস তাহাকে বলিলেন, "আমার কাছে আসিতে হইলে দিনের বেলায় অন্যান্য লোক যখন আসে তখন আসিবে, রাত্রে কখনই আসিবে না।" সেই রমণী ঠাট্টা করিয়া রামদাসের কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিল। পরের দিন সেই যুবতী সন্ধ্যার পরে উপস্থিত হইলে

রামদাস ধমক দিয়া এক টুক্‌রা পাথর ছুঁড়িয়া মারিলেন এবং বলিলেন যে "তোমাকে মানা করিয়াছি তবু কেন রাত্রে আসিয়াছ?" সেই দিন সেই স্ত্রীলোক পলাইয়া গেল আর কখনও আসিল না।

যুগে যুগে সাধকদিগের তপস্যা নষ্ট করিবার জন্য এইরূপ উৎপাতের আবির্ভাব হইয়া থাকে, ইহারই নাম "প্রেতিণীর উৎপাত।"

কাঠিয়া বাবা।

রামদাস গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া গুরুদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন গুরু তাঁহাকে কাঠের "আড়বন্ধ" এবং কাঠের কৌপিন পরাইয়া দিলেন। এই হইতে তাঁহার নাম হইল "কাঠিয়া বাবা।"

কঠোর পরীক্ষা।

রামদাস দিবসে গুরুর সেবা করিতেন, রাত্রিকালে আসন ছাড়িয়া কোথাও যাইতে তাঁহার প্রতি অনুমতি ছিল না। এই সময় তাঁহারা উত্তরাখণ্ডে ছিলেন, সেখানে শীতকালে বরফ পড়িত। গুরুদেব একটী ঝুপ্‌ড়ীতে থাকিতেন, শিষ্যকে একটা গাছতলায় থাকিতে হইত। তিনি সমস্ত রাত্রি ধুনীর সম্মুখে আসন করিয়া জপ করিতেন।

একদিন রাত্রিতে রামদাস নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আহুতির অভাবে এবং হিমপাতে ধুনী নিভিয়া গিয়াছিল, কিছুক্ষণ

পরে ভয়ানক শীতে কম্পিত-কলেবর হইয়া রামদাস জাগিয়া উঠিলেন এবং দেখিলেন, ধুনী নিভিয়া গিয়াছে। অন্যত্র যাওয়া গুরুর নিষেধ অথচ আগুন না পাইলে প্রাণান্ত হওয়ার সম্ভাবনা, অগত্যা তিনি গুরুর ঝুপ্‌ড়ীর দ্বারে উপস্থিত হইলেন। পদশব্দ শ্রবণ করিয়া গুরু জিজ্ঞাসা করিলেন "কোন্ হ্যায়?" শিষ্য বলিলেন, "মঁয় রামদাস হুঁ।" গুরু বলিলেন "আসন ছাড়িয়া কেন আসিলে?" শিষ্য বলিলেন যে, ধুনী নিভিয়া গিয়াছে। শিষ্যের উত্তর শুনিয়া গুরু বলিলেন, "তবে তুমি ঘুমাইয়া ছিলে? এই জন্যই কি ঘর বাড়ী, পিতামাতা ছাড়িয়া আসিয়াছ?" শিষ্য বলিলেন, "মহারাজ, কসুর হো গিয়া"। গুরুদেব শিষ্যকে এক ঘণ্টা বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিতে বলিলেন। রামদাস সেই দারুণ শীতে বাহিরে দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিলেন, একঘণ্টা গত হইলে গুরুদেব একটা জ্বলন্ত কয়লা বাহিরে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "লইয়া যাও, আর এমন কাজ করিও না।"

গুরুর এইরূপ ব্যবহার আজিকালিকার লোকের নিকট অত্যন্ত নিষ্ঠুরতা বলিয়া মনে হইতে পারে কিন্তু এইরূপ কঠোরতার মধ্যে গুরু শিষ্যের যে মধুর সম্বন্ধ দেখা যায়, অন্যত্র তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় না। গুরুদেব শিষ্যকে মায়ের মতন স্নেহ করেন এবং শিষ্যও গুরুর ইঙ্গিতে প্রাণপাৎ করিতে কুণ্ঠিত হন না। একমাত্র ধর্ম্মবন্ধন ভিন্ন গুরু শিষ্যের মধ্যে অন্য কোনওরূপ স্বার্থের বন্ধন নাই।

নিদ্রাকে পরাজিত করিয়া "গূঢ়াকেশ" হওয়া ইন্দ্রিয় জয়ের প্রধান উপায়। অধিকাংশ সাধক রাত্রিকালে ২।৩ ঘণ্টার অধিক নিদ্রা যান না, জাগিয়া থাকিয়া ভগবানের নাম করেন। নাম করিতে করিতে যখন সারাটী রাত্রি শেষ হয় তখন প্রভাতকালে যে স্ফূর্ত্তি ও চিত্ত-প্রসন্নতা জন্মে, নিদ্রালুব্ধ অলস ব্যক্তির জীবনে তাহা অনুভব করার অধিকার নাই। পরম-সম্পৎ দানের জন্যই এদেশীয় গুরুগণ শিষ্যকে কঠোর শাসন করিয়া থাকেন।

শেষ কথা।

শ্রীযুক্ত তারাকিশোর চৌধুরী মহাশয়ের ঐকান্তিক প্রার্থনায় রামদাস কাঠিয়া বাবা একবার কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার দর্শন ও উপদেশ পাইয়া শত শত শিক্ষিত বাঙ্গালী নরনারী কৃতার্থ হইয়াছেন। অনেকে তাঁহার নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়াছেন। কলিকাতার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কাঠিয়া বাবার অনুগত লোকের সংখ্যা অল্প নহে। তাঁহাদের অনেকের ভক্তি-প্রীতি ও ত্যাগ-স্বীকার দেখিয়া বাঙ্গালী জাতিকে ধন্য বলিয়া মনে হয়।

সিদ্ধাবধূত রামদাস কাঠিয়া বাবা ১৩১৬ সালের মাঘ মাসে শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে রাত্রি প্রায় ৩ টার সময় ঋষি-মুহূর্ত্তে শ্রীশ্রীবৃন্দাবনধামে দেহরক্ষা করিয়া নিত্যধামে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শিষ্যগণ এখনও তাঁহার কৃপালাভ করিয়া ধন্য

হইতেছেন। শ্রীযুক্ত তারাকিশোর চৌধুরী মহাশয় প্রাণ খুলিয়া বহুসহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া তাঁহার গুরুদেবের আশ্রমে মনোহর মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আমরা আশা করি, কোন ভক্ত-লেখক কাঠিয়া বাবার একখানি পূর্ণাঙ্গ জীবন চরিত লিখিয়া বাঙ্গলা দেশের ও বাঙ্গলা ভাষার কল্যাণ-সাধন করিবেন।

মহাত্মা নরসিংহ দাস বা পাহাড়ী বাবা।

হিমালয়ের বরফাবৃত প্রদেশে ইঁহার তপস্যাস্থান। ঐ প্রদেশকে সাধুরা বরফান বলেন। তথায় বহু দূরে দূরে এক একটী গহ্বরে এক একজন সাধু থাকেন; একের সহিত অন্যের সাক্ষাৎ হওয়া সহজ ব্যাপার নহে। কন্দমূলই সেখানে ইঁহা-দিগের উপজীবিকা।

মহাত্মা নরসিংহদাস জটা-শ্মশ্রুধারী। ইনি কৌপিন পরি-ধান করেন এবং কটিদেশে রাশিকৃত ডুরি বাঁধেন। সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম লেপন করেন, কখন কখন গাত্রে কম্বল ব্যবহার করেন। শেষ-রাত্রে স্নান করিয়া আপনার ক্রিয়া করিতে বসেন। ইনি অধিকাংশ সময়ই নয়ন মুদ্রিত করিয়া ধ্যান করেন। বাবাজী অত্যন্ত অল্পভাষী, কিন্তু যখন কথা বলেন তখন তাহা এমনই মিষ্ট লাগে যে, সেই এক কথাই বারবার শুনিতে ইচ্ছা হয়।

ইঁহার সারল্যমাখা বালস্বভাব এবং সুধামাখা মৃদু-হাস্য অপার্থিব বস্তু। ক্ষুধার উদ্রেক হইলে ইনি বালকের মতন খাবার চান, তাহাতে ইঁহার কোন সঙ্কোচ নাই। কাহাকেও কিছু বলিতেও সঙ্কোচ নাই *। খাওয়া দাওয়ার কথায় তিনি বলিতেন, "ভগবান্ যখন যেভাবে রাখিবেন তাহাতেই তুষ্ট থাকিতে হইবে। তিনি যে কেবল সুখেই রাখিবেন এমন কোন কথা নাই"। বাবাজী এই ভাবটী আবার কবিতায় প্রকাশ করিয়া বলিতেন "কভি ঘি ঘনা, কভি মুটিভর চানা, কভি চানা ভি মানা"। কখনও ঘৃতপক্ক নানাবিধ খাদ্য, কখনও একমুষ্টি ছোলামাত্র, কখনও সে ছোলামুষ্টিও জুটে না। সাধুরা এই ভাবেই জীবন কাটান। যিনি লুচি মণ্ডা ও উপবাসকে সমান

* একদিন গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে বসিয়া ধুনী তাপিতে-ছিলেন, হটাৎ বালকের মতন বলিয়া উঠিলেন "বড়ি ভুকলাগা" বড় খিদে পেয়েছে। গোঁসাইজীর আদেশে তখনই কতকগুলি কিসমিশ, বাদাম, ও পেস্তা (ইহাই ঘরে ছিল) দেওয়া হইল, বাবাজী শিশুর মতন দুই হাতে তুলিয়া মুখে দিতে লাগিলেন। আমি আবর্জনা ও খোসা বাছিয়া পরিষ্কার করিয়া দিতেছিলাম তাহা দেখিয়া তিনি আমার কোলে উঠিয়া শুইয়া পড়িয়া দক্ষিণ হাতে আমার গলাটী জড়াইয়া ধরিলেন। তাঁহার আদরে ও স্পর্শে আমি অতুল আনন্দ অনুভব করিলাম, আমার শরীর মন জুড়াইল। আমি তাঁহাকে কোলে করিয়া খাওয়াইতে লাগিলাম; এইরূপে তিনি আমার প্রাণে বাৎসল্য ভাবের উদ্বোধন করিয়া দিলেন। লেখক।

আদরে প্রভুর দান বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন তিনিই প্রকৃত-ভক্ত।

মহাত্মা নরসিংহ দাস "তুঁহি মেরা প্রাণ" বলিয়া যাহাকে আলিঙ্গন করিতেন, সে-ই কৃতার্থ হইত। একদিন কয়েকটী ব্রজবাসীর সহিত বাবাজীর বড় ঝগড়া বাধিয়া গেল। ব্রজ-বাসীরা পাহাড়ী বাবার প্রভাব কিছুই না জানিয়া তাঁহাকে সামান্য লোক জ্ঞানে অনেক কটু কথা বলিলেন। "তোমার মতন সাধু ঢের দেখিয়াছি, অমন জটা ধরা, ছাই মাখা, আমাদের ঢের জানা আছে। আমরা ব্রজবাসী, আমরা বাক্‌সিদ্ধ, সাধুর গৌরব আমাদের কাছে কি?" ইত্যাদি ঢের কথা তীব্রভাবে বাবাজীকে বলা হইল। বাবাজীও "হাম্ দেখ্‌তা হ্যায় তোম্‌লোগ্ কুস্ নেহি হ্যায়" ইত্যাদি বলিলেন। তাহাতে ব্রজবাসীরা আরও চটিয়া গেলেন। বাবাজী তাঁহাদিগকে ভালমন্দ না বলিয়া নয়ন মুদ্রিত করিলেন। কি আশ্চর্য্য শক্তিতে ব্রজবাসীদিগের প্রদীপ্ত অভিমান একেবারে নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। আমরা দেখিয়া অবাক্ হইলাম যে, তখনই সেই ব্রজবাসীদের মধ্যে যিনি বিশেষ কটু বলিতেছিলেন তিনি প্রথমে হাতজোড় করিয়া তাহার পর বাবাজীর পায়ে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থণা করিলেন। কি শক্তিতে যে হটাৎ এই কার্য্যটী করাইল, তাহা বাহির হইতে ঠিক বুঝা যায় না। ব্রজবাসীদের পক্ষে কাহারও পায়ে পড়া বড় সোজা কথা নহে।

বাবাজীর মুখে অনেক সময়ই কয়েকটী কথা শুনা যাইত যথা ; "আনন্দং পরমানন্দং, পরমানন্দং পরম-সুখং, পরম-সুখং পরম-তৃপ্তিঃ, পরম-তৃপ্তিঃ পরম-শান্তিঃ, পরম-শান্তিঃ পরম-গতিঃ" আর বলিতেন "সৎসঙ্গঃ পরম্ সম্পদ্"। বাবাজী নিজে সর্ব্বদাই পরমানন্দে থাকেন এবং সৎসঙ্গ যে পরম-সম্পৎ তাহাও তাঁহার সঙ্গলাভে অনুভূত হয়। *

* কুম্ভমেলার পরে পাহাড়ী বাবা কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, এবং দীর্ঘকাল তথায় বাস করিয়াছিলেন। এই সময়ে অনেক শিক্ষিত-বাঙ্গালী তাঁহার শিষ্যত্বগ্রহণ করেন। গতবৎসর শিমূলতলায় তাঁহার অন্যতম শিষ্য শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ মিত্র (হাইকোর্টের সরকারি উকীল শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের পুত্র) মহাশয়ের উদ্যোগে পাহাড়ী বাবার তিরোধানোৎসব সম্পন্ন হইয়াছিল। অনেক সংশয়ী ও পথভ্রষ্ট বাঙ্গালী তাঁহার কৃপায় ধর্ম্ম বিশ্বাস ও সুপথ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মহাত্মা ভিখম্ দাস।

মহাত্মা ভিখম্ দাসের আশ্রম বাঁকিপুরে। মেলাস্থলে ইনিও অবাধ-সদাব্রত খুলিয়াছিলেন। অনেক সাধু-সজ্জন ও দীন-দুঃখীকে ইহাঁর আশ্রম হইতে অন্ন দেওয়া হইয়াছে। ভিখম্ দাস যে কেবল মেলায় আসিয়া এইরূপ অতিথিসৎকার করিতেন তাহা নহে, ইহাঁর আশ্রমে বারমাসই সদাব্রত চলিতেছে। আরাধ্য দেবতার উপর ইহাঁর আশ্চর্য্য নির্ভর।

কোথাও হইতে এক পয়সা আসার ভরসা কি সম্ভাবনা নাই এবং কাহারও নিকট কিছু প্রার্থনা করা নাই, সঞ্চয় ত কিছুই নাই কিন্তু বাবাজীর আশ্রম হইতে অতিথি কখনই নিরাশ হইয়া যায় না। তাঁহার অতিথি-সৎকারের প্রণালী এই যে, বাজারের সর্ব্বোৎকৃষ্ট তণ্ডুল ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঘৃতাদি দ্বারা অতিথির সেবা হইবে। একদিন রাত্রিতে তাঁহার আশ্রমে একদল সাধু আসিয়া অতিথি হইলেন। দলটীতে প্রায় তিনশত মূর্ত্তি। ভিখম্‌দাসের ভাণ্ডারে কিছুই নাই, হস্ত কপর্দ্দক-শূন্য। সাধুদল দুদিন পর্য্যন্ত উপবাসী, বাবাজীর মনের অবস্থা পাঠক একবার চিন্তা করুন। তিনি একান্ত অনন্যোপায় হইয়া আরাধ্য-দেবতা রাম-সীতার মন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক সটান শুইয়া পড়িলেন। আর কাহার কাছে যাইবেন, এ সঙ্কটে কে উদ্ধার করিবে? একমাত্র ভগবান্ ভিন্ন বাবাজীর ত আর আশ্রয় নাই। সেই অগতির গতি, ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরুই ভক্তের একমাত্র আশা ভরসা। সজলনয়নে ভিখম্‌দাস প্রার্থনা করিলেন "প্রভো, আমারত কেউ নাই, আমিত আর কাহার ও কাছে প্রার্থনা করিনা, দুই দিবসের অনাহারী সাধুদল উপস্থিত, এখন আমার আশ্রম-ধর্ম্ম রক্ষা কর।" ভিখম্‌দাস যখন এই ভাবে আরাধ্য-দেবতার চরণে পড়িয়া আছেন, এমন সময় কে আসিয়া মন্দিরের দ্বারে আঘাত করিল। বাবাজী ফিরিয়া চাহিলে সে ব্যক্তি বলিল "আমরা কোন কার্য্যে জয়লাভের জন্য সীতারামকে মানত করিয়াছিলাম, সে কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে এবং সীতারামের



মহাত্মা স্বামী গম্ভীরানাথ—গোরক্ষপুর

Emerald Ptg. Works, Calcutta

জন্য আমরা অমুক মহাজনের নিকট দুই শত টাকা রাখিয়া দিয়াছি, আপনি উপস্থিত হওয়া মাত্র তিনি আপনাকে সেই টাকা দিবেন।” ভিখম্‌দাস শুনিয়াই তৎক্ষণাৎ ছুটীয়া গিয়া সেই মহাজনের নিকট হইতে টাকা লইয়া আসিলেন এবং মহা সমারোহে অতিথিসৎকার হইয়া গেল। এই ঘটনা বাঁকি-পুরের অনেক শিক্ষিত লোকই অবগত আছেন। ভিখম্‌দাস একজন বিশ্বাসী বৈষ্ণব, তাঁহার ভক্তি, বিনয়, সদাশয়তা ও নির্ভরশীলতা অতি আশ্চর্য্য। *

মহাত্মা গম্ভীরনাথ।

ইনি নাথ যোগী। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে গয়াতে কপিলধারার নিকট ইহাঁর আশ্রম ছিল। ইনি স্থায়ী ভাবে কোথায় থাকেন ঠিক জানি না। ইহাঁর বিষয় বিশেষ বর্ণনা করার কিছু নাই। যেরূপ তাকাইয়া একটু মাথা নাড়িয়া ইনি ইঙ্গিতে প্রাণ ভিজাইয়া দেন, তাহার বর্ণনা হয় না। ইনি অত্যন্ত অল্পভাষী। সাধুরা ইহাঁকে সিদ্ধ-পুরুষ বলিয়া জানেন। ইনি বহু শিষ্য সঙ্গে মেলাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। একদিন একজন ধনী ইহাঁর আসনের নিকট পাঁচশত খণ্ড কম্বল রাখিয়া যান। গম্ভীরনাথ ধ্যানস্থ ছিলেন, কিছু পরে নেত্র উন্মিলিত করিয়া দেখিলেন রাশিকৃত

---

* কয়েক বৎসর হইল ইনি দেহরক্ষা করিয়াছেন, বাঁকিপুরে তাঁহার শিষ্যগণ আশ্রমরক্ষা করিতেছেন।

কম্বল। বাঁ-হাতের অঙ্গুলী ঈষৎ নাড়িয়া বলিলেন, 'যাহাদের দরকার আছে তাহাদিগকে এ সকল দিয়া দাও'। তখনই সমস্ত বিতরিত হইয়া গেল।

মহাত্মা গম্ভীরনাথ বাবাজী এক্ষণে গোরক্ষপুরে গোরক্ষনাথের মন্দিরে আছেন। বহু সংখ্যক ধর্ম্মপিপাসু বাঙ্গালী সেই দূরদেশে যাইয়া ইঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। গত বৎসর ইনি কলিকাতায় শুভাগমন করিয়াছিলেন। সহস্র সহস্র ধর্ম্মার্থী ইঁহাকে দর্শন করিয়াছেন এবং শত শত ব্যাকুলাত্মা নানাদিক্ হইতে কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া ইঁহার কৃপালাভ করতঃ দীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক কৃতার্থ হইয়াছেন। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, এইবারে এই মহাপুরুষের সবিশেষ বিবরণ কিছু লিখিতে পারিলাম না. যদি জীবনে কুলায় ও ভাগ্যে থাকে তবে ভবিষ্যতে এই আশা পুর্ণ করার আকাজ্ক্ষা রহিল।

মহাত্মা ছোট কাঠিয়া বাবা।

দুঃখের বিষয় এই মহাত্মার নামটী জানিতে পারি নাই। ইনিও কাঠের কৌপীনধারী, সুতরাং কাঠিয়া বাবা। ইহাঁর আনন্দ-মুর্ত্তিটী মনে করিয়া এখনও যেন প্রাণ শীতল হয়। কুম্ভ-মেলায় তিন ব্যক্তির হাসি দেখিয়াছি, সেরূপ হাসি মানুষের হাসি বলিয়া মনে হয় না। সেই তিনজনের মধ্যে এই মহাত্মা একজন। ইঁহার সঙ্গে আমাদের অনেক সময় দেখাশুনা হইয়াছে।

যখনই ইনি আমাদের মধ্যে ইঁহার সদানন্দ মূর্ত্তিখানি প্রকাশিত করিয়াছেন, তখনই চারিদিকে একটী বিমল আনন্দময় ভাব উথলিয়া উঠিয়াছে। সে মূর্ত্তি কখনও অপার্থিব ও মধুময় সেই ঈষৎ হাস্যকে পরিত্যাগ করে নাই। কথা না কহিলেই বা কি, দেখিলেই যে তৃপ্তি! যখন একটু একটু মাথা নাড়িয়া মধুর দৃষ্টিতে কথা বলেন, তখন ভাষা যেন বালক-কণ্ঠ-নিস্থতার ন্যায় মাধুরীময়ী হইয়া যায়। বাবাজী সম্পূর্ণ নিঃসম্বল। এরূপ নিঃসম্বল সাধু মেলায় অল্পই ছিলেন। প্রায় সকল সাধুরই মাথার উপরে কিছু না কিছু একটা আচ্ছাদন আছে, অন্ততঃ মাথার উপরে একটা ছোট ছাতাও আছে কিন্তু এ বাবাজীর মাথার উপরে অনন্ত আকাশ বই আর কিছু নাই। বসিবার একখানা অতি ক্ষুদ্র ছেঁড়া চাটাইয়ের আসন। ইনি দিবারাত্র কোনপ্রকার শীতবস্ত্র অথবা অন্য কোন গাত্রাবরণই ব্যবহার করেন না। ইঁহার পরিধানে একটী কাঠের কৌপীন মাত্র।

বাবাজীর আপাদমস্তকের সঙ্গে একগাছা পশুলোম বা একগাছা সুত্রের সম্পর্ক নাই। বৃক্ষ যেমন দিবানিশি শীত গ্রীষ্ম সহ্য করে, বাবাজী ঠিক সেই রূপ ষড় ঋতুকে উপেক্ষা করেন। এলাহাবাদের ভয়ানক শীতে সম্পূর্ণ অনাবৃত স্থানে (কয়েকদিন বৃষ্টিও হইয়াছিল) আনন্দ-মূর্ত্তি বাবাজী সম্পূর্ণ নিঃসম্বল হইয়া সহাস্যমুখে প্রেমানন্দে দিবাযামিনী যাপন করিয়াছেন। রাত্রে কখন ধুনা থাকে মাত্র। সাধুদিগের মধ্যে অনেকে কোন না কোন প্রকার মাদক-দ্রব্য ব্যবহার করেন কিন্তু এই বাবাজী

গুড়ুকটুকু পর্য্যন্ত খান্ না। পূর্ব্বে ইনি গাঁজা খাইতেন এবং অন্যান্য নেশাও করিতেন। ইঁহার মাদক পরিত্যাগের বিবরণটী অতি চমৎকার। অনেক সময়ই ইনি নির্জ্জন-পাহাড়ে থাকিয়া সাধন করিতে ভালবাসিতেন। পাহাড়ে নানা প্রকার ফল ও কন্দমূল পাওয়া যায়, তাহা খাইয়া অনেক দিন কাটান যাইতে পারে কিন্তু গাঁজা ও তামাক প্রভৃতির জন্য নীচে আসিয়া ভিক্ষা করিতে হইত। একদিকে মাদকের আসক্তি এবং অন্যদিকে পাহাড়ের সৌন্দর্য্য ও সাধনের অনুকুলতা, উভয়ের মধ্যে বিরোধ ঘটিলে ইনি সমস্ত মাদক একেবারে পরিত্যাগ করিলেন। ইনি জগতে কাহারও নিকট কিছু প্রার্থনা করেন না। আমাদিগের সাক্ষাতে একজন ইঁহাকে চারিটা জামা দিলেন, ইনি দাতার মনোরক্ষার্থ তাহা হাতে রাখিলেন এবং দাতা চলিয়া গেলে বাহির হইয়া রাস্তায় যাইতে যাহাদিগকে নিকটে দেখিলেন তাহাদিগকে দিয়া দিলেন। ইঁহার কিছুরই যেন প্রয়োজন নাই। আনন্দমূর্ত্তি বাবাজীর আনন্দ বই আর কিছুই নাই। শরীরটী বড়ই সুস্থ ও সুগঠিত, চাহনিটীর মধ্যে একটু লুকোচুরী ভাব আছে, সেটুকু বড়ই মধুর। ইঁহার উপদেশ দিবার অভ্যাস নাই, কথা প্রসঙ্গে দুই এক কথা যাহা বলেন তাহা সার কথা। ইঁহাকে দেখিলেই দেখা শুনা উভয় কার্য্য হয়। মনে হয় বাবাজীর অন্তর যেন প্রেম-ভক্তিতে পরিপূর্ণ। অনেকে বলেন, বাবাজীর বয়স শতাধিক বৎসর, কিন্তু দেখিতে কোনরূপেই চল্লিশ বৎসরের অধিক মনে হয় না।

মহাত্মা অর্জ্জুন দাস বা ক্ষেপাচাঁদ।

এই মহাত্মার আচার-ব্যবহার ও কার্য্যকলাপ অতীব বিচিত্র। ইহাঁকে বিশেষভাবে না জানিতে পারিলে সহজে পাগল বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু বিশেষ বিশেষ সাধুরা ইহাঁকে মহাপুরুষ বলিয়াই জানেন। একদিন আমাদের কাছে মহাত্মা ছোট কাঠিয়াবাবা ক্ষেপাচাঁদকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "এ জ্ঞানপাগলা হ্যায়।" বস্তুতঃ অর্জ্জুনদাস যখন আপনাকে গোপন রাখিতে ইচ্ছা করেন তখনই পাগল হন। অন্য সময় জ্ঞানপ্রেমের মূর্ত্তি রূপে প্রকাশিত হন। এই মহাত্মা কোনরূপ সাম্প্রদায়িক চিহ্ন ধারণ করেন না। আমি যে কয়েকদিন ইহাঁকে দেখিয়াছি, দেখিলাম একটা কম্ফার্টার দিয়া কৌপিন করিয়াছেন। আমি ৫।৬ দিন দিবারাত্রি অনেক সময়ই ইহাঁর সঙ্গ পাইয়াছি, তাহাতে ইহাঁর কতকগুলি আশ্চর্য্য শক্তি দেখিলাম। দেশ দেশান্তরের লোক আসিতেছে, কত লোকই প্রতিদিন আসিতেছে, যেখান হইতে যে আসিতেছে তাহাকেই সেই দেশীয় ২।১ জন সাধুর কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। মনে হয় যেন সকল দেশের সকল সাধুর সঙ্গেই তাঁহার পরিচয়। আবার কথা প্রসঙ্গে যে কেহ যে কোন শাস্ত্র হইতে একটী শ্লোক বলিল, অমনি সেই-স্থান হইতে অনেকগুলি শ্লোক আওড়াইয়া যাইতেছেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্ম সম্বন্ধে সাধুরা অনেকেই বিশেষ অভিজ্ঞ নহেন, সন্ন্যাসী মহাশয়েরা অনেকে কিছুই জানেন না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, কিন্তু অর্জ্জুনদাসের কিছুই যেন অবিদিত নাই, তিনি বিশেষরূপে সমস্তই জানেন। তিনি বাঙ্গলা কোন গ্রন্থ পড়েন নাই, বলেন এসব "ধ্যানমে মিলা"। একদিন ধ্যানের মধ্যে "জয় রূপ, জয় সনাতন" বলিয়া উঠিলেন। সময়ান্তরে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, রূপ সনাতনের কথা কোথায় জানিলেন ? বাবাজী বলিলেন "ধ্যান মে মিলা"। এই বাবাজী হটযোগ ও অনেক করিয়াছেন। ধৌতি ও নানাপ্রকারের আসন প্রতিদিনই করিয়া থাকেন, সে নিয়ম রক্ষার অন্যথা হয় না। তাঁহার শরীরটী এমনই হাল্কা, মনে হয় যেন চলিয়া যাইতে মাটির উপরে উপরে ঈষৎ মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়া যাইতেছেন। শরীর সুগঠিত ও সুস্থ। দিবা রজনীর অধিকাংশ সময়ই তিনি নয়ন মুদ্রিত করিয়া ধ্যানে মগ্ন থাকেন, মাঝে মাঝে অপূর্ব্ব আনন্দ ও অপ্রাকৃত-সুখ-ব্যঞ্জক নানাবিধ শব্দ উচ্চারণ করেন, মনে হয় উহা যেন হৃদয়-ভাণ্ড ভরিয়া অজ্ঞাতসারে উপচিয়া পড়িতেছে।

একবার বাবাজীকে কতকগুলি দুষ্টলোক প্রহার করে। যখন তাহারা মারিতেছিল তখন বাবাজী "খুব মার, খুব মার" বলিয়া নাচিতেছিলেন। শাস্ত্রে সাধুর একটী বিশেষ অবস্থা বলা হইয়াছে "জড়োন্মত্তপিশাচবৎ"। সাধু, জড়ের ন্যায় সহিষ্ণু ও নিশ্চেষ্ট, উন্মত্তের ন্যায় কখনও হাসেন কখনও কাঁদেন, কখনও নৃত্য করেন, কখনও প্রলাপ বলেন, তিনি পিশাচের ন্যায় জীর্ণ

পরিচ্ছদ-ধারী ও বিধিনিষেধ-বর্জ্জিত হইয়া থাকেন। ভাগবতে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের শেষ অবস্থার এইরূপ বর্ণনা আছে। মহাজ্ঞানী, মহাদার্শনিক ভাগবতকার মহাসাধুর যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আমাদের ন্যায় অজ্ঞ ও অজ্ঞানেরা অনায়াসেই উঁহাকে কুসংস্কার-জাত বা ভ্রমবুদ্ধি-প্রসূত মনে করিয়া থাকে। যাহা হউক মহাত্মা অর্জ্জুনদাস ভাগবত লক্ষণোক্ত মহাসাধু। অর্জ্জুনদাস অনাসক্ত জীবন্মুক্ত পুরুষ। ইহাঁর যে, কোনও বিষয়ে কিছুমাত্র আসক্তি আছে কিছুতেই তাহা বুঝা যায় না। কোন অবস্থাই ইহাঁকে বিষণ্ণ করিতে পারে না। একবার দ্বারভাঙ্গায় ইনি রাস্তার মাঝখানে ময়ূরাসন করিয়া বসিয়াছিলেন। এক সাহেবের গাড়ী আসিয়া প্রায় তাঁহার উপর পড়িবার উপক্রম হইলেও, তিনি নড়িলেন না। তখন পাগল জ্ঞান করিয়া পুলিশ তাঁহাকে ধরিয়া নিয়া পাগলাগারদে রাখিল। তাহাতে বাবাজী কিছুই আপত্তি করিলেন না। ডাক্তার সাহেব বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন ইহাতে পাগলের কোন লক্ষণ নাই সুতরাং তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। বাবাজী জেল হইতে বাহির হইয়া বলিলেন,—"বেশ ছিলাম, ক্ষুধার সময় আহার পাওয়া যাইত, দিনরাত সাধন করিতে পারিতাম, কোনও চিন্তা ছিল না।"

মহাত্মা অর্জ্জুনদাসের প্রেমের কথা বর্ণন করিতে আমার শক্তি নাই। যে রূপেই কেহ বর্ণন করুন না কেন, তাহাতেই তাঁহাকে খাটো করা হইবে। তিনি যে জগৎকে, মনুষ্যজাতিকে

কি চক্ষে দেখেন, তাহা ধারণা করিতে আমাদের কিছুমাত্র ক্ষমতা নাই। সমস্ত নরনারীর মধ্যে ইনি ইঁহার আরাধ্য দেবতা রামকে দেখিতে পান। স্ত্রীলোক হউক, পুরুষ হউক, বালক বৃদ্ধ, জ্ঞানী মূর্খ, সাধু অসাধু যেই হউক, "আহা মেরা রাম" বলিয়া সকলেরই মুখের কাছে হাত ঘুরাইয়া এমন সতৃষ্ণ দেব-দৃষ্টিতে তাকাইয়া সকলকে আরতি করেন যে, একান্ত পাষাণ-হৃদয় ব্যক্তিও মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারে না। মেলার সময়ে পুলিস সাহেব একটী রাস্তায় কোন প্রয়োজনে কিছু কালের জন্য কাহাকেও যাইতে দিতেছিলেন না, ক্ষেপাচাঁদ তাঁহার মুখের কাছে হাত নিয়া এমন ভাবে আরতি করিলেন যে, সাহেব মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দিলেন। ক্ষেপাচাঁদের মনুষ্য-প্রেম এক অদ্ভুত বস্তু। তিনি মানুষ দেখিলেই যেন মুগ্ধ হইয়া যান। কত লোক পাগল ভাবিয়া তাঁহাকে উপেক্ষা করিতেছে, কিন্তু তিনি সকলের প্রতিই প্রেমপূর্ণ। যখন সাধুরা স্নান করিতে চলিলেন, তখন ক্ষেপাচাঁদ কি করিবেন, আনন্দে ছুটাছুটী করিতে লাগিলেন, কত লোককেই আরতি করিতে লাগিলেন। আবার এক স্থানে দাঁড়াইয়া কিছুকাল বক্তৃতা করিলেন। যাহা বলিলেন, তাহা সুগভীর ধর্ম্মতত্ত্ব। যখন তাঁহার চারিদিকে লোকারণ্য হইল, তখন দু'একটা পাগলামীর কথা বলিয়া সেখান হইতে ছুটিলেন। সে পাগলামীর কথাগুলি যে বেথাপ ও ইচ্ছাকৃত, তাহা বেশ বুঝা যায়। লোক তাঁহার দিকে বেশী ঝোঁকে, তিনি তাহা ভালবাসেন না।

একদিন ইঁহার লোকানুরাগের একটী দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমরা একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। আমি আর ২।৩টী বাঙ্গালী, একত্রে ঝুঁসী হইতে চড়ায় যাইতেছিলাম। দারাগঞ্জের পুল পার হইতেছি, তখন দেখিলাম, ক্ষেপাচাঁদ কাঁদিতে কাঁদিতে পুলের উপর দিয়া পূর্ব্বমুখে চলিয়াছেন। আমরা ত দেখিয়া অবাক্। ইনি এরূপ করিয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতেছেন কেন? আমরা কাছে গিয়া প্রণাম করিয়া রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। কোন বালক, সঙ্গীদের নিকট মার খাইয়া আসিলে যেরূপ কাঁদে সেই রূপ কাঁদিতে কাঁদিতে আমাদিগকে বলিলেন,—"সিপাহী (পুলিশ) লোক আমাকে মারিয়াছে, আমি আর এ দেশে থাকিব না, ভোটান চলিয়া যাইব এবং সেখানে বেলপাতার রস খাইয়া থাকিব, আর লোকালয়ে ফিরিব না।" এই বলিয়া আবার আকুল হইয়া ঠিক বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন। বাবাজীর কথায় আমাদের প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিল। আহা! এমন সরল-প্রেম-পূর্ণ প্রাণে আঘাত করে এমন পাষণ্ডও আছে? দুঃখের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ক্রোধেরও উদ্রেক হইল। আমরা বলিলাম, "বাবাজী, আপনি ফিরিয়া চলুন। কোন্ সিপাহী আপনার গায়ে হাত তুলিয়াছে, আমাদিগকে দেখাইয়া দিন, প্রাণপণে আমরা ইহার প্রতিবিধান করিব।" বাবাজী যেন বড়ই ভরসা পাইলেন এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে আরতি করিতে করিতে আমাদের সঙ্গে চলিলেন। দারাগঞ্জের পুল পার হইয়া

আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম,—"বাবাজী, কোন্ সিপাহী আপনাকে মারিয়াছে দেখাইয়া দিন।" তখন বাবাজী বলিলেন,—"বাবা, আমার এই শরীর কেহ স্পর্শ করে নাই, কিন্তু আমার কাছে কাল মারিয়াছে এক ভাগলপুরীকে এবং আজ মারিয়াছে এক বুড়াকে, তাহাতে আমার সমস্ত গায়ে বেদনা লাগিয়াছে। উহাদেরও শরীর, আমারও শরীর, আমার কাছে উহাদের মারাতে আমি বড় ব্যথা পাইয়াছি। মানুষ মানুষকে মারে, ইহা আমি সহ্য করিতে পারিনা, আমি এই লোকালয় ছাড়িয়া যাইব" এই বলিয়া বাবাজী কাঁদিতে লাগিলেন। আমরা ত ঘটনা শুনিয়া বসিয়া পড়িলাম। সিপাহীর প্রতি যে ক্রোধ জন্মিয়াছিল, তাহা কোথায় চলিয়া গেল। জগতে এক নূতন দৃশ্য দেখিলাম, মানুষ অন্যের দুঃখ এতদূর অনুভব করে, গল্পেও ত এরূপ শুনি নাই। সন্নাসীরা অন্যের সুখ-দুঃখের দিকে তাকান না, মনে যে এইরূপ একটা সাহঙ্কার-কুসংস্কার ছিল, তাহা একেবারে বিনষ্ট হইয়া গেল। আমরা লোকের জন্য কিছু খাটিয়া থাকি, তাহা যে সিন্ধুর নিকট বিন্দুও নহে তাহা দেখিতে পাইয়া আমার দর্প-চূর্ণ হইল। মনে হইল ভগবান্ আমাকে বিশেষ শিক্ষা দেওয়ার জন্যই এই ঘটনা আমার নিকট উপস্থিত করিলেন। পরের দুঃখে, মনের ক্লেশে বাবাজী সারাদিন আহার করেন নাই, বেলা অবসান হইয়া গিয়াছে, আমরা তখন এক দোকানে লইয়া গিয়া তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া কিছু খাওয়াইলাম।

এই বাবাজীর প্রখর-বুদ্ধি অগাধ-পাণ্ডিত্য, অপরিসীম লোকানুরাগ এবং অনধিগম্য আধ্যাত্মিকতা সত্ত্বেও তিনি "জড়োন্মত্ত পিশাচবৎ" হইয়া বিচরণ করেন।

মেলার অবসানে তিনি হটাৎ কোথায় চলিয়া গেলেন। যাঁহারা সঙ্গে এবং নিকটে ছিলেন কেহই তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইলেন না। ইহাঁর সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত প্রবাদ প্রচলিত আছে। লোকে বলে ইনি কেমন করিয়া কোথা হইতে কোথা যান, কেহ বুঝিতে পারে না। ইহাঁর নির্দ্দিষ্ট আশ্রম কোথায় কেহ জানেনা। কেহ কেহ বলিল যে, বাবাজীকে অনেক সময় বিন্ধ্যাচলে দেখা যায়। আমাদের কোন বন্ধু ইহাঁকে একদিন ইহাঁর বয়সের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবাজী উত্তর করিলেন, "এক সময় বাবা বলিয়াছিলেন, কুড়ি বৎসর"। কথা শুনিয়া আমরা হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না। আমার সেই বন্ধুটী বলিলেন, আপনার কি একটা হিসাব নাই? বাবাজী বলিলেন, "আমি রামনাম করি, দিন গণনা কে করে? করিতে আমার অবসর ও নাই"। বাবাজী যে কথা বলিবেন না বা যে কার্য্য করিবেন না তাহা বলাইতে বা করাইতে কাহার ও শক্তি নাই। কোন প্রকার তোষামোদ বা কাতরতায় তাঁহাকে ভুলাইবার সাধ্য নাই। একটী লোক কোন মোকদ্দমা জিতিবার জন্য বাবাজীর নিকট কিছু ধুনীর ভস্ম চাহিল। বাবাজী প্রায় ঘণ্টাধিককাল নানাবিধ কথাবার্ত্তায় তাহাকে ভুলাইয়া রাখিলেন। সে কোনরূপে বাবাজীর হাতের বিভূতি পাইল না অথচ বাবাজীর ব্যবহারে বিরক্ত হইতে

পারিল না। যাঁহারা ইহাঁকে দেখিয়াছেন তাঁহাদের সকলের চিত্তপটেই ক্ষেপাচাঁদ চিত্রিত হইয়া রহিয়াছেন।

"কুম্ভমেলার" পরে মহাত্মা অর্জ্জুনদাস বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে কিছু ছোলাভাজা ও মাধুকরী পুঁটুলিতে বাঁধিয়া লইয়া প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়কে খাওয়াইবার বাসনায় কলিকাতা আসিলেন। গোঁসাইজী কোথায় থাকেন ক্ষেপাচাঁদ তাহা জানিতেন না, কিন্তু গঙ্গার পুলপার হওয়ার পরেই গোস্বামী মহাশয়ের পরম ভক্তশিষ্য শ্রীধরচন্দ্রের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল, শ্রীধর সেদিন যদৃচ্ছাক্রমে গঙ্গাতীরে গিয়াছিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে যখন ক্ষেপাচাঁদ মিলিত হইলেন তখন গঙ্গাযমুনা সঙ্গমের ন্যায় অপূর্ব্ব দৃশ্য হইল। সেই মিলন-ক্ষেত্রে আনন্দ ও ভক্তির তরঙ্গ উঠিয়াছিল। ক্ষেপাচাঁদ যখন পুঁটুলী খুলিয়া বৃন্দাবনের ছোলাভাজা ও মাধুকরী গোস্বামী মহাশয়কে দিলেন, তখন যে কি আনন্দের ঢেউ উঠিল, উপস্থিত সকলের মধ্যেই কিরূপ ভাবেরখেলা খেলিল, তাহার বর্ণনা হয় না। এই কয়টী ছোলা-ভাজা খাওয়াইতে ক্ষেপাচাঁদ বৃন্দাবন হইতে কলিকাতায় আসিয়াছেন, সম্ভবতঃ তিনি পদব্রজেই আসিয়াছিলেন। এমন প্রেম না জন্মিলে কি মানুষ "ক্ষেপা" হইতে পারে? যাহা মুখে ভাল লাগিয়াছে তাহা কি প্রেমস্পদ-ব্যক্তিকে না দিয়া থাকা যায়? তাই বৃন্দাবন হইতে ছোলাভাজা লইয়া কলিকাতা আসিয়াছেন। এই ছোলা দানের সময় দাতা গৃহীতা উভয়েরই অপূর্ব্ব অবস্থা হইয়াছিল।

ক্ষেপাচাঁদ কিছুদিন গোস্বামী মহাশয়ের নিকট ছিলেন। একদিন রাস্তায় একজন ইলিশ মাছ লইয়া যাইতেছে দেখিয়া "মেরা রাম" বলিয়া সেই মৎস্যটীকে অনেকক্ষণ আরতি করিলেন, বলিলেন—"মৎস্যাবতার হ্যায়"। এই পরম জ্ঞানী, সান্তের মধ্যে কিভাবে অনন্তকে

দেখিতেন তাহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। তিনি সমস্ত পুরুষকেই "মেরা রাম" বলিয়া আরতি করিতেন। একদিন আমার কোন পরমাত্মীয়া মহিলা (গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যা) ক্ষেপাচাঁদকে প্রণাম করিলে তিনি দাঁড়াইয়া উক্ত মহিলার মুখের নিকট হাত ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া "গোপীভাবে রাধাভাবে" বলিয়া আরতি করিতে লাগিলেন। অনেক স্ত্রীলোককে তিনি এইভাবে আরতি করিতেন। নিষ্কাম, নির্বৈর, অনাসক্ত, জীবন্মুক্ত, সর্ব্বজীবে সমদর্শী, দয়া ও প্রেমের জীবন্তমূর্ত্তি, ক্ষেপাচাঁদ আপনার লীলা সাঙ্গ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার চরিত্র-সৌরভ সহস্র সহস্র হৃদয়-কানন সুবাসিত করিয়া রাখিয়াছে। ইহাঁর জীবনই জীবন্ত উপদেশ, উপদেশ প্রদানের আবশ্যকতা রাখে না।

প্রভুপাদ মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

বাংলাদেশে ইহাঁর নাম অনেকেই জানেন। নানাপ্রকার মত ও সাধনার মধ্য দিয়া ইনি যে ধর্ম্মে উপনীত হইয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ অসম্প্রদায়িক। সাধুমণ্ডলে বাঙ্গালীদের বড় আদর নাই। মৎস্যাহারী বাঙ্গালীদিগকে সাধুরা একরূপ ধর্ম্মবর্জ্জিত বলিয়াই জানেন। কিন্তু গোস্বামী মহাশয়ের একমাসকাল কুম্ভে অবস্থানে অধিকাংশ সাধুরই সে সংস্কার দূর হইয়া গিয়াছে। বড় বড় মহাত্মাগণ ইহাঁকে যেরূপ প্রেম করিয়াছেন, যেরূপ শ্রদ্ধা

দিয়াছেন এবং ইহাঁর সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা বঙ্গদেশের বিশেষ গৌরবের কথা। মহাত্মা বড় কাঠিয়া বাবা ইহাঁর নাম করিয়া বলিতেন, "বাবা প্রেমী হ্যায় উস্‌কা বহুৎ প্রেম হ্যায়।" বৈষ্ণবেরা কি অর্থে "প্রেম" শব্দের ব্যবহার করেন, তাহা যিনি জানেন, তিনিই বুঝিবেন। গম্ভীরানাথ ও ঠিক ঐ কথাই বলিতেন। মেলার প্রধান প্রধান মহাত্মাগণ, যাঁহাদের সঙ্গে গোস্বামী মহাশয়ের একবার দেখা হইয়াছে তাঁহারা সকলেই তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়াছিলেন। একদিন দেখা না হওয়াতে বড় কাঠিয়া বাবা বলিয়া পাঠাইলেন যে, "হাম্‌ উন্‌কা দরশন্‌কা ভূঁখা হ্যায়।"—আমি উহার দর্শনের জন্য ব্যাকুল। মহাত্মা দয়ালদাস কাঠিয়াদিগকে পুনঃ পুনঃ বলিলেন যে, "বাঙ্গালী বাবাকে আমি আবার কিরূপে দেখিতে পাইব।" মহাত্মা ছোট কাঠিয়া বাবা দিনের মধ্যে কতবারই ইহাঁর কাছে আসিতেন, যেন ইহাঁকে না দেখিয়া থাকিতে পারিতেন না। মহাত্মা অর্জ্জুন-দাস বা ক্ষেপাচাঁদ ইহাঁকে আরতি করিতেন আর বলিতেন, "সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু হ্যায়।" ক্ষেপাচাঁদ অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা গোস্বামী মহাশয়ের মধ্যে কি দেখিতেন, তাহা আমরা বুঝি না; কিন্তু তিনি বলিতেন, "এ বাবা সাচ্চা সাধু হ্যায়।"

অন্তর-রাজ্য বলিয়া যে একটা রাজ্য আছে মানুষ যতদিন তাহার খবর না পায়, ততদিন সকল লোককেই সমান দেখে। মনে করে সাধুদের ও বুদ্ধি, বিবেচনা, তর্কশক্তি, শাস্ত্রজ্ঞান আছে,

আমাদেরও আছে। কোন কোন শক্তি আমাদের অধিক আছে, সুতরাং তাঁরা আর বড় কিসে? যে পর্য্যন্ত মানুষের এইরূপ জ্ঞান থাকে, সে পর্য্যন্ত সাধুভক্তি হয় না। মতামতের বিশুদ্ধতাকে অর্থাৎ সাধারণ জ্ঞান যাহাকে বিশুদ্ধ মত বলে, তাহাকেই কষ্টিপাথর করিয়া যাঁহারা সাধু অসাধু নির্ণয় করেন, তাঁহারা প্রকৃত সাধুতা দেখিতে পান না। তাঁহারা কেবল সুগঠিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখিতে পান, কিন্তু প্রাণ কোথায় তাহা জানেন না। যাঁহারা চিন্তার অতীত, বুদ্ধির অতীত, বিচারের অতীত, অধ্যাত্মরাজ্য বিশ্বাস করেন, যে রাজ্যে প্রবেশ করা শারীরিক বল, বিচার বল বা বিশুদ্ধ মতের কর্ম্ম নয়, এমন রাজ্যে প্রবেশ করিতে যাঁহাদের লালসা জন্মে, তাঁহারা অন্তর্নিবিষ্ট সাধুদিগকে সাধারণ লোক মনে করেন না। যাঁহারা আত্মতত্ত্বজ্ঞ, তাঁহারা লম্বা জটা কি মালাতিলক, বহুশাস্ত্র-জ্ঞান কি বিচার-পাণ্ডিত্য, এসব বড় গ্রাহ্য করেন না। দু'জন সাধুতে মিলন হইলে উভয়েই প্রায় কিছুকাল ধ্যানস্থ থাকেন, এবং অন্য কোন কথা না বলিয়াই উভয়ে উভয়কে চিনিয়া লন। কুম্ভমেলায় গোস্বামী মহাশয়কে অবিসংবাদিতরূপে সকল মহাত্মারাই মহাপুরুষ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তিনি যখন সাধুদর্শন করিতে বাহির হইতেন তখন রাস্তার চারিধারে সকলেই তাঁহার দর্শনে আনন্দপ্রকাশ করিতেন। তাঁহাকে দেখিলেই চারিদিক হইতে "হরি বল্, হরি বল্" ধ্বনি উঠিত। এমন কি সোঽহংবাদী সন্ন্যাসীরাও তাঁহাকে দেখিয়া হরিধ্বনি করিতেন।

গোস্বামী মহাশয় বৈষ্ণব-মণ্ডলীর মধ্যে আপনার আসন স্থাপিত করিয়াছিলেন। এলাহাবাদের কোন ভদ্রলোক তাঁহার আশ্রমের জন্য একটী বড় তাঁবু দিয়াছিলেন। উহার মধ্যে যত লোক ধরে, নিরন্তর প্রায় ততলোক থাকিত। আহারের সময় যাহারা আসিয়া বসিবে তাহারাই অন্ন পাইবে,—এখানে এইরূপ নিয়ম ছিল। দৈনিক যাহা আসিত, প্রতিদিনই খরচ হইয়া যাইত, পরের দিন যখন জুটিত, তখন আবার আহারের আয়োজন হইত। গোস্বামী মহাশয়ের আশ্রমে যখন যিনি আসিয়া যে অভাব জানাইয়াছেন, প্রায় তখনই তাহা পূর্ণ হইয়াছে। কেহ আসিয়া বলিলেন, আমার কম্বল নাই,—দাও উহাকে দু'টাকা; কেহ বলিলেন, আমার ঘটী নাই,—দাও উহাকে একটাকা; কেহ বলিলেন, ধুনীর কাঠ নাই,—দাও উহাকে একটাকা; কেহ বলিলেন, রেলভাড়া নাই—দাও যাহা প্রয়োজন। যতক্ষণ টাকা নিঃশেষ না হইতেছে, ততক্ষণ অনবরত এইরূপ চলিতেছে। টাকা ফুরাইয়া গেলে, নিজের গাত্রবস্ত্র ও আসনের কম্বল পর্য্যন্ত দেওয়া হইয়াছে।

একদিন এলাহাবাদ সহরের একজন ধনী, গোস্বামী মহাশয়ের নিকট আসিয়া জোড়হস্তে দাঁড়াইলেন। আমরা ভাবিলাম ব্যাপার কি? দেখিলাম, কয়েকজন লোক প্রকাণ্ড গাঁটুরী সঙ্গে করিয়া তাঁবুর দ্বারে উপস্থিত হইল। ঐ ধনী ব্যক্তি উক্ত গাঁটুরীতে একহাজার জামা লইয়া আসিয়াছেন। ইচ্ছা, গোস্বামী মহাশয় তাহা গ্রহণ করিয়া ইচ্ছামত বিতরণ করেন। তাঁহার

দান গৃহীত হইল এবং একঘণ্টার মধ্যেই একহাজার জামা বিতরিত হইল। গৃহীরা মনে করেন, সাধুদের মধ্য দিয়া দান করিলে দানটী বেশ নিষ্কামভাবে হইবে।

গোস্বামী মহাশয়ের আশ্রমে গৌরনিতাই মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় সেখানে সংকীর্ত্তন ও আরতি হইত। মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পর শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া স্মরণ করিলেই অন্তরে স্বামীর সাক্ষাৎ দর্শন পাইতেন। কিন্তু একান্ত পতিপ্রাণা, প্রিয়তমকে কেবল অন্তরে দর্শন করিয়া তৃপ্ত হইতে পারিলেন না, সেই অন্তরস্থিত মূর্ত্তিকে বাহিরের চর্ম্মচক্ষে দেখিতে তাঁহার লালসা জন্মিল, তখন হৃদয়স্থ মূর্ত্তির প্রতিরূপ বাহিরে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অদ্যাপি নবদ্বীপধামে বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতিষ্ঠিত সেই গৌরাঙ্গমূর্ত্তি পূজিত হইতেছেন। যে ভাবে, যে প্রেম-প্রেরণায় বিষ্ণুপ্রিয়া জীবনময় ছবির প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, প্রয়াগ চড়ায়, গোস্বামী মহাশয়ের আশ্রমেও সেই অনুরাগে গৌরনিতাই মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। যে প্রয়াগে মহাপ্রভু, শ্রীযুক্ত রূপ গোস্বামী মহাশয়কে দীক্ষা ও শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন, সেই প্রয়াগবাসীরা শ্রীচৈতন্য কি চৈতন্যধর্ম্মের নাম জানেনা বলিলেই হয়। কতকাল পরে আবার সেইস্থানে গৌর-নিতায়ের নাম ধ্বনিত হইল। কে জানে, আবার প্রয়াগবাসী গৌরপ্রেমে ভাসিবে কি না ?

গোস্বামী মহাশয়ের পরিচয়।

যিনি ভগীরথের ন্যায় কঠোর তপস্যায় বঙ্গদেশে ভক্তি-গঙ্গা আনয়ন করিয়া পৃথিবীকে পবিত্র করিয়াছেন, যিনি বঙ্গীয় বৈষ্ণব-সমাজে "সাক্ষাৎ ঈশ্বর" বলিয়া অদ্যাপি পূজিত হইয়া থাকেন, সেই দেশ-পাবন শান্তিপুর-নাথ শ্রীশ্রীপ্রভুপাদ অদ্বৈত আচার্য্যের বংশে প্রভুপাদ আনন্দকিশোর গোস্বামীর ঔরশে স্বর্ণময়ীর স্বর্ণগর্ভে বঙ্গাব্দ ১২৪৮ সালের ১৯শে শ্রাবণ ঝুলন পূর্ণিমার রাত্রিতে নদীয়া জেলার অন্তর্গত শিকারপুর গ্রামে মাতুলালয়ে প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীমদদ্বৈত আচার্য্য হইতে তিনি নবম পুরুষের ব্যবধান।

বাল্য-জীবন।

শিশুকাল হইতেই তাঁহার সরলতা, সাহস, সত্যবাদিতা, ন্যায়নিষ্ঠা, দয়া ও ধর্ম্মভাব তাঁহাকে আত্মীয় ও প্রতিবেশীদিগের দৃষ্টিতে অন্যান্য বালকদিগের হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছিল। তিনি সমবয়সীদিগের নেতা ও একান্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁহাকে সঙ্গী না করিলে খেলার সাথীদিগের আনন্দলাভ হইত না। এই প্রত্যুৎপন্নমতি চঞ্চল বালকটী বিবিধ প্রকারের নূতন নূতন খেলা ধূলার সৃষ্টি করিয়া বালকগণকে বিমোহিত করিতেন। আবার কোথাও হরিনাম শুনিলে হটাৎ খেলা ছাড়িয়া দিয়া ভাবে অভিভূত হইয়া সেইখানে বসিয়া পড়িতেন। ৭।৮ বৎসর বয়সের সময় কীর্ত্তন শুনিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন। তখন সাথীগণ "বিজয়ের ভাব লেগেছে, ভাব লেগেছে" বলিয়া তাঁহাকে



মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

Emerald Ptg. Works, Calcutta.

টানিয়া লইয়া যাইতে চেষ্টা করিত। মহা তেজস্বী বালক তখন কিন্তু তাহাদের সেই অত্যাচারের কিছুমাত্র প্রতিশোধ লইতে চেষ্টা করিতেন না, তিনি ভাবে বিভোর থাকিতেন। শান্তিপুরে কোন এক সাধু তাঁহার অবস্থা দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, এ বালক কালে মহাভক্ত হইবে।

বাল্যকালে খেলার সাথিগণের সঙ্গে মিলিয়া তিনি বিপদ-সঙ্কুল অনেক ঘটনার মধ্যে পড়িয়াছেন; তখন তাড়া খাইয়া সমস্ত বালক দৌড়াইয়া পলাইয়াছে, বিজয়কৃষ্ণ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন এবং জিজ্ঞাসু হইয়া অপরাধ স্বীকার করিতে কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই। তাঁহার সাহস ও সরলতা দেখিয়া ক্ষতিগ্রস্থ ক্রোধাবিষ্ট ব্যক্তিগণও তাঁহাকে কটুকথা বলিতে ইচ্ছা করেন নাই।

বাল্যকাল হইতেই তাঁহার নীতিজ্ঞান এতই তীব্র ছিল যে, একবার যাত্রার দলের ছোকরাদিগের সঙ্গে মিশিয়া তাঁহার একজন অতি-প্রিয় খেলার সাথী মদ্যপান করিয়াছিলেন, সেই বালকের মুখে মদের গন্ধ পাইয়া বালক বিজয়কৃষ্ণ বলিলেন, "তোর সঙ্গে আর কখনও খেল্‌বো না", তাঁহার যে কথা সেই কাজ।

বাল্যকালে জননীর সঙ্গে শিষ্যবাড়ী যাইয়া তিনি এতই সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছিলেন যে, শিষ্যগণ এই "বাবা গোঁসাই"কে অন্যান্য সমস্ত গোঁসাই-সন্তান অপেক্ষা ভালবাসিতেন ও ভক্তি করিতেন।

শিশুকালে তিনি গৃহ-দেবতা শ্যাম-সুন্দর জিউকে আপনার সঙ্গী করিবার জন্য এবং খাওয়াইবার জন্য নিরতিশয় ব্যাকুল হইতেন। একাকী দেবতার সঙ্গে অনেক কথা বলিতেন। বিগ্রহকে ঠিক জীবন্ত ব্যক্তি জ্ঞানে তাঁহার অবাধ্যতার জন্য ধমকাইতেন এবং তাঁহার নামে জননীর নিকট নালিশ করিতেন।

গোঁসাইজীর বাল্য-চরিত্র অবলম্বন করিয়া তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের পুত্র শ্রীযুক্ত সীতানাথ গোস্বামী মহাশয় "বালক-বিজয়কৃষ্ণ" নাম দিয়া এক খানি গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থে গোস্বামী মহাশয়ের যে সকল বাল্য-সহচর শান্তিপুরে এখনও জীবিত আছেন, তাঁহাদের মুখ হইতে ঘটনাবলী সংগৃহিত হইয়া লিপিবদ্ধ হইয়াছে, এ স্থলে সে অমৃতময় কাহিনী উদ্ধৃত করার অবকাশ হইবে না।

ধর্ম্মমত।

কিশোর বয়সে একদা কোন প্রৌঢ়শিষ্যা, প্রচলিত প্রথা অনুসারে তাঁহার চরণ পূজা করিয়া তাঁহার নিকট পরিত্রাণ প্রার্থনা করিলেন। গোঁসাইজী ভয়ে সশঙ্কিত হইয়া পা টানিয়া লইলেন এবং সেই শিষ্যাকে বলিলেন যে, সে তাঁহার প্রতি যে সকল গুণের আরোপ করিতেছে তাহা তাঁহার নাই এবং পরিত্রাণ দানের কোন ক্ষমতাও তাঁহার নাই। গোস্বামী-সন্তানগণের মুখে কেহ কখনও এরূপ কথা শুনে নাই, শুনিবার প্রত্যাশাও করে নাই। শিষ্যা চরণ-পূজা সমাপ্ত করার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ দেখাইলেন, কিন্তু কিশোর-বয়স্ক গুরু তাহাতে রাজি হইলেন না। এই ঘটনার দ্বারা তিনি তাঁহাদের সংসারের একমাত্র উপজীবিকা ও বংশগৌরবকে উপেক্ষা করিলেন।

গ্রামের টোলে পাঠ সমাপ্ত করিয়া গোঁসাইজী কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করিলেন। বেদান্ত পাঠ করিয়া তিনি জানিলেন "সর্ব্বংখল্বিদং ব্রহ্ম," জগৎ সমস্তই ব্রহ্মময়। পূর্ব্বেই গোস্বামী প্রভুদিগের আচরণ কুল-ধর্ম্মের উপর তাঁহার অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার বুভুক্ষু হৃদয় অনাহারে থাকিতে পারেনা, তাঁহার জন্য ধর্ম্মার একান্তই

প্রয়োজনীয়, তাহাতে বেদান্তের উপর হিন্দু-সন্তানের স্বাভাবিক অনুরাগ ও শ্রদ্ধা অনায়াসে তাঁহাকে ব্রহ্ম-জ্ঞানের দিকে আকর্ষণ করিয়া লইল। এই সময় ব্রাহ্ম-সমাজের কতকগুলি পবিত্র-চরিত্র লোকের সঙ্গে তাঁহার আলাপ হইল। মতে ও চরিত্রে তাঁহাদের সঙ্গে অনেকটা মিলন হওয়ায় ক্রমে ক্রমে তিনি ব্রাহ্ম-সমাজে যোগদান করিলেন। তিনি ব্রাহ্ম-সমাজের আকর্ষণে পড়িয়া ব্রাহ্ম হন নাই, ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়া ব্রাহ্মদিগের সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন। ধর্ম্মের জন্যই তিনি ব্রাহ্ম হইয়াছিলেন, সমাজ সংস্কারের কি ধর্ম্ম-সংস্কারের জন্য ব্রাহ্ম-সমাজে প্রবেশ করেন নাই। তাঁহার হৃদয়ের প্রবল ধর্ম্মাগ্নি, আহুতি লাভের জন্য সর্ব্বদাই লেলিহান ছিল, যেখানে যে আহুতি পাইয়াছে তাহাই আত্মসাৎ করিয়াছে। হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, খৃষ্টান যে কোনও শাস্ত্র হইতে যে কোন সম্প্রদায় হইতে, সৎকথা ও সৎসঙ্গ রূপ অরণী প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, সমস্তই ধর্ম্ম যজ্ঞের আহুতিরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে।

নানা কারণে প্রচলিত ধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস হারাইয়া "সত্যংশাস্ত্রমনশ্বরম্" যাহা সত্য তাহাই ধর্ম্ম, এই বিশ্বাসে উপনীত হইলেন, তখন তাঁহার জন্য অন্য কোনও উপায় ছিল না। তিনি চির জীবনই সত্যের উপাসক ছিলেন, সত্য-রক্ষার জন্য সংসারের উপজীবিকা গুরুত্ব ব্যবসায়, শান্তিপুরের জনসাধারণের অতুল অনুরাগ তাঁহাকে ভুলাইতে পারে নাই। ১৩০৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসের "নব্য-ভারতে" আমি লিখিয়াছিলাম,—

"তাঁহার জীবনের গতি বাষ্পীয়-শকটের গতির ন্যায় তীব্র ও অনন্যমুখাপেক্ষী ছিল। বাষ্পীয় শকট যেমন সরল ও প্রবল গতিতে অগ্রগামী হইবার সময় পশ্চাৎদিকে ফিরিয়া চায় না, সৌন্দর্য্যপূর্ণ পার্ব্বত্য উপবন, কলনাদিনী গিরিনদী, হংস-সারস-সমাকুল-প্রস্ফুটিত-কমলশোভিত বিমল হ্রদ, অতুল ঐশ্বর্য্যশালিনী মহানগরী কিছুতেই তাহাকে বাঁধিয়া

রাখিতে পারেনা, কোন আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়াই সে ক্ষণকাল অকারণ প্রতীক্ষা করে না এবং যাত্রিগণকে পলকে পলকে নব নব সৌন্দর্য্য দেখাইয়া দেখাইয়া আপনার নির্দ্দিষ্ট-পথে লক্ষ্যস্থলে ছুটিয়া যায়; সেইরূপ তাঁহার জীবন-শকট, সরলতার পবিত্র-পথে, ধর্ম্মানুরাগের তীব্র-গতিতে, সংসারের মান-মর্য্যাদা, যশ-জিগীষা, ঘৃণা লজ্জা, সম্প্রদায়-সাম্প্রদায়িকতা, স্নেহ-মমতা, এবং বন্ধুত্ব ও বিরাগ প্রভৃতিকে দুই পাশে অতিক্রম করিয়া, উন্মাদ-ব্যাকুলতায়, অক্লান্ত-সাধনায়, দর্শকমণ্ডলীকে নূতন নূতন ধর্ম্মতত্ত্বে আলোকিত করিয়া লক্ষ্যস্থলে ছুটিয়া গিয়াছে। বাল্যকালে স্নেহময়ী জননীর করুণ অশ্রু, বন্ধুবান্ধবগণের সহজ ও সরল স্নেহানুরাগ তাঁহাকে কর্ত্তব্যবুদ্ধি হইতে বিচলিত করিতে পারে নাই। আদি ব্রাহ্মসমাজে শ্রীমৎ দেবেন্দ্র নাথের অতুল-প্রতাপ ও বিপুল-ভালবাসা নিরাশ্রয় যুবককে ভুলাইতে পারে নাই। কেশবচন্দ্রের বিশ্বব্যাপিনী-প্রতিভা ও অসীম অনুরাগ, বাল্যসখা আজন্ম-সাধু অঘোরনাথের অকপট ও অপরিমেয় বন্ধুত্ব, তাঁহাকে গন্তব্য-পথ হইতে বিচলিত করিতে পারে নাই। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সাধারণ-তন্ত্রী হইলেও, মতান্তরের পূর্ব্বে তিনি ঐ সমাজের শিরোমণি ছিলেন। যেখানে গোঁসাই, সেইখানেই উৎসব, যে গৃহে তিনি, সেই গৃহই সরস, কি সহর কি মফঃস্বল, সকল স্থলের ব্রাহ্ম-নরনারীগণের মনের আকর্ষণ তাঁহার দিকেই ছিল। ব্রাহ্মসমাজের আবাল-বৃদ্ধ সকলেই তাঁহাকে শ্রেষ্ঠতম উপদেষ্টা এবং আপনাদের সর্ব্বোচ্চ অধিনায়ক মনে করিতেন। তাঁহার ন্যায় সর্ব্বতোমুখী ভক্তি-শ্রদ্ধা সে সমাজে কেহই কখন প্রাপ্ত হন নাই। কিন্তু সেই দলপতিত্বের গৌরব, ধর্ম্মবন্ধুগণের অনুরাগ ও অসংখ্য-নরনারীর ভক্তি-শ্রদ্ধা তাঁহাকে তাঁহাদিগের দলের মধ্যে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই। ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগের পর ঢাকায় আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইলে অনুগত শিষ্যগণ পৈতৃক বাসভবন পরিত্যাগ করিয়া, কেহ কেহ

বা বিক্রয় করিয়া তাঁহাকে বেষ্টন পূর্ব্বক বাস করিতেছিলেন। তাঁহাদের অনুরাগের কথা মনে হইলে সত্যযুগের কথা স্মরণ হয়। তাঁহারা তাঁহার জন্য সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহার অভাবে তাঁহারা জীবন অন্ধকার ও জগৎ শূন্যময় দেখেন, সেই সমস্ত শিষ্যবর্গের প্রাণগত ভালবাসা তাঁহাকে সেখানে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই।

শ্রীবৃন্দাবনের বৈষ্ণবদিগের তাঁহার প্রতি অতুল অনুরাগ ও প্রবল অনুরোধ তাঁহার বেশ পরিবর্ত্তন করিতে পারে নাই।

জীবনের আদি হইতে শেষ পর্য্যন্ত কখন তিনি মানুষের মুখ চাহিয়া চলেন নাই, অথচ তাঁহার ন্যায় মানব-প্রেমিক, বন্ধুবৎসল ও মিষ্টভাষী কে ছিল"?

এদেশের সমষ্টিগত জাতীয়-জীবনের ইতিহাসের এবং সাধকজীবনের ব্যক্তিগত ইতিহাসের একই প্রকার ধারা। উপনিষৎ হইতে আরম্ভ করিয়া ভগবদ্‌গীতা ও ভাগবতাদি পুরাণ যেমন জাতীয় ইতিহাসের ক্রমাভিব্যক্তি, ব্রহ্মজ্ঞান হইতে আরম্ভ করিয়া অবতারবাদ ও সাকার উপাসনা ও সেইরূপ হিন্দু-সাধকের ব্যক্তিগত সাধনার ক্রম-বিকাশ। বঙ্গদেশের প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেব, দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণবগুরু রামানুজ প্রভৃতি সমস্ত ধর্ম্মগুরুগণ, আপনাদের জীবনে এই ক্রম-বিকাশের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানের খবর রাখিতেন না, একান্ত অনভিজ্ঞ ব্যক্তি ভিন্ন একথা কেহই বলিতে পারে না! হিন্দুর এমন কোন্ ধর্ম্মগ্রন্থ আছে যাহাতে ব্রহ্মজ্ঞানের সংবাদ নাই? দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ, অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ, সমস্তই হিন্দু-তত্ত্ব। ব্রহ্মজ্ঞানের বিবিধ তত্ত্ব জানিয়াও ভাগবতাদি পুরাণকারগণ অবতারবাদী ও সাকার উপাসক। যিনি বেদান্তবিচারে ভারতের সমস্ত পণ্ডিতবর্গকে পরাজয় করিয়াছিলেন, যিনি ব্রহ্মজ্ঞানের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার

করিয়াছেন, সেই মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবই পুরুষোত্তমে গরুড়স্তম্ভের নিকট দাঁড়াইয়া দারুব্রহ্ম দর্শন করিতে করিতে চক্ষুর জলে ভাসিয়া গিয়াছেন। এই তত্ত্ব না বুঝিলে হিন্দুধর্ম্ম এবং হিন্দুসাধকের জীবন-লীলা বুঝা যায়না।

যে সকল দেশে কি সমাজে অবতারবাদের উৎপত্তি হইয়াছে, সর্ব্বত্রই উহা নিরাকার একেশ্বরবাদের অভিব্যক্তি। যেখানে নিরাকার একেশ্বরবাদ নাই, সেখানে অবতারবাদ জন্মিতে পারেনা। আর আমাদের দেশের শাস্ত্রোক্ত সাকার উপাসনা কোল্ ভিলের অথবা জুলুজাতির সাকার উপাসনা বা প্রকৃতি-পূজা নহে। আমাদের সাকার উপাসনার ভিত্তি বেদান্তজ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত। সর্ব্বত্র পূর্ণব্রহ্ম, একটী কাঁটার অগ্রভাগেও তিনি পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত। যে স্থলে বা বস্তুতে সাধকের ভক্তি কেন্দ্রিভূত হয়, সেই কেন্দ্র তাঁহার অস্তিত্বে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, তখনই ব্রহ্ম লীলাময়।

গোস্বামী মহাশয়ের ধর্ম্ম পূর্ণাঙ্গ-হিন্দুধর্ম্ম ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, তিনি রামানুজ ও শ্রীচৈতন্যের অনুগামী ছিলেন। ইহাঁরা কেহই নানা ধর্ম্ম হইতে উপদেশ সংগ্রহ করিয়া পাঁচফুলের একটী স্তবক প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করেন নাই, সাধনা দ্বারা ধর্ম্মের বিবিধ স্তরের সত্যতা উপলব্ধি করিয়াছেন। তাঁহার জীবন-ব্যাপী সাধনার মধ্যে ব্রহ্মবাদী ব্রহ্মজ্ঞান, অবতারবাদী ভক্তিতত্ত্ব এবং সাকারবাদী সাকারতত্ত্ব প্রস্ফুটিত দেখিতে পাইবেন।

গোস্বামী মহাশয় গতানুগতভাবে কোন তত্ত্বই গ্রহণ করেন নাই। তিনি বুদ্ধদেবের ন্যায় সর্ব্ব-প্রকার সংস্কার পরিত্যাগ করিয়া চিত্তকে একান্ত কল্পনাশূন্য করিয়াছিলেন। পরে সাধনার স্তরে স্তরে সেই সংস্কার-বিহীন নির্ম্মল-চিত্তে যখন যে তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে, ভগবানের

সাক্ষাৎ দান জানিয়া তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। এ বিষয় কখনও লোকের কিম্বা লোকাচারের মুখাপেক্ষা করেন নাই।

যখন বঙ্গদেশে নব্য ব্রাহ্মধর্ম্ম একটা প্রবল শক্তিরূপে দণ্ডায়মান হইল, উপেক্ষার যোগ্য রহিল না,তখন একজন একনিষ্ঠ সাধকের সর্ব্ব প্রকারের ব্রাহ্ম-সাধনার মধ্য দিয়া প্রকৃত হিন্দু-সাধনায় উপস্থিত হওয়া একান্ত আবশ্যকীয় হইয়াছিল। গোস্বামী মহাশয়ের মতন সরল স্বার্থহীন, ধর্ম্ম-প্রাণ সাধকের দ্বারা বিধাতা সেই প্রয়োজন সু-সম্পন্ন করিয়াছেন। "সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং" এই তত্ত্ব অবলম্বন করিয়াই তিনি দুর্গা বলিয়া তরী ভাসাইয়াছিলেন, বহুবিঘ্নপূর্ণ তরঙ্গ-সঙ্কুল নদনদী উত্তীর্ণ হইয়া বহুদেশ বেষ্টন করিয়া অবশেষে ঘাটের তরী আসিয়া ঘাটে লাগিয়াছে। সে তরীতে সর্ব্ব প্রকারের সাধনার বীজই সংগ্রহীত হইয়াছে, কাজেই গোস্বামী মহাশয়কে ব্রাহ্মগণ ব্রহ্মজ্ঞানী, যোগিগণ যোগী, শাক্তগণ শাক্ত এবং বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণব বলিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি আছে ?

গোস্বামী মহাশয় প্রেতাত্মার অস্তিত্বে এবং জীবদেহে ও বৃক্ষাদিতে উহাদের আবির্ভাব ও অবস্থানে বিশ্বাস করিতেন, এ বিষয় তাঁহার বিশ্বাস হিন্দুযোগী ও পাশ্চাত্য অবতার যিশুখৃষ্টের অনুরূপ ছিল।

তিনি হিন্দু ঋষিগণের এবং বুদ্ধদেবের ন্যায় পুনর্জ্জন্ম-বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বজন্মের কোন কোন ঘটনা তিনি বলিয়াছিলেন।

গোঁসাইজী হিন্দু ও খৃষ্টানের ন্যায়ই অবতারবাদ মানিতেন।

তিনি কোন গ্রন্থের অথবা কোন ব্যক্তির মত অবলম্বন করিয়া কোন বিশ্বাসে উপস্থিত হন নাই, সমস্ত তত্ত্বই আপনার জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে লাভ করিয়াছেন।

গুরু-গ্রহণ।

পুরুষকারের চরম সাধনায় যখন পুরুষকার বিনষ্ট হইল, তখন গোস্বামী মহাশয় গয়ার আকাশ গঙ্গা (কপিলধারা) পাহাড়ে সদ্‌গুরু লাভ করিয়া তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। দীক্ষা গ্রহণের পরে উক্ত পাহাড়ে একটা গোফার মধ্যে দিনের পর দিন ধ্যানমগ্ন ছিলেন। এই সময় ৺রঘুবরদাস নামে একজন রামায়েৎ বৈষ্ণব সাধু, শিশুসন্তানের ন্যায় তাঁহাকে দুগ্ধাদি তরল খাদ্য প্রদান করিয়া তাঁহার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। আকাশগঙ্গা পাহাড়ে যে সর্ব্বোচ্চ স্থানে গোস্বামী মহাশয় দীক্ষা গ্রহণ করেন, সেই স্থানে পাহাড়ের গায়ে শিলাক্ষরে সেই বিবরণ লিখিত আছে। আকাশগঙ্গা তাঁহার বিশেষ তপস্যার স্থান; সেই স্থানে উপস্থিত হইলে, সেই গোফায় প্রবেশ করিলে ভক্তের প্রাণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। এইটী তাঁহার সিদ্ধিলাভের স্থান।

গয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি প্রকাশ্যরূপে গুরুবাদ স্বীকার করেন এবং অনেক ধর্ম্মার্থী ব্রাহ্ম-ব্রাহ্মিকা তাঁহার নিকট মন্ত্র-দীক্ষা গ্রহণ করেন। যদিও ইতঃপূর্ব্বে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রাচীন আচার্য্য অধ্যাপক উমেশচন্দ্র দত্ত, প্রসিদ্ধ প্রচারক নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় এবং জ্ঞানি-ভক্ত কালীনাথ দত্ত প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মগণ হিন্দুগুরুর নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি গোস্বামী মহাশয়ই মুক্তভাবে ব্রাহ্মসমাজে গুরুদীক্ষার আবশ্যকতা ঘোষণা করিলেন। ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মমতাবলম্বী শতশত পিপাসু নরনারী তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইতে লাগিলেন। গোস্বামী মহাশয়কে যে জন্য ব্রাহ্মসমাজের মধ্য দিয়া আসিতে হইয়াছিল।

হইয়াছিল এত দিনে সেই প্রয়োজন সিদ্ধ হইল। গোস্বামী মহাশয়ের এই পরিবর্ত্তনে ব্রাহ্ম এবং ব্রাহ্ম-মতাবলম্বী নিরহঙ্কার ধর্ম্মপিপাসু নরনারীর প্রাণে যে পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছে ও করিবে তাহাতে ধর্ম্মসাধন সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজে যুগান্তর উপস্থিত হইবে।

বিলাতের সু-প্রসিদ্ধ ধার্ম্মিকবর কার্ডিনেল নিউম্যানের শেষ বয়সে ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তন হওয়ায়, প্রটেষ্টাণ্ট চার্চ্চের একজন নেতা বলিয়াছিলেন যে, কার্ডিন্যাল নিউমানের চরিত্র, জ্ঞান ও ধর্ম্মভাব এরূপ উচ্চ যে তিনি প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম পরিত্যাগ করায় উক্ত সমাজের উপর যেরূপ আঘাত পড়িল তাহা সামলাইতে শত বৎসর লাগিবে।

এই দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গোস্বামী মহাশয় সম্বন্ধে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রসিদ্ধ প্রচারক ও আচার্য্য পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বলিয়াছেন যে, "গোস্বামী মহাশয়ের মত পরিবর্ত্তন হওয়ায় ব্রাহ্মসমাজের উপর এমনই আঘাত পড়িল যে, সমাজ উহা কতকালে সামলাইবে বলিতে পারি না।"

আমাদের কিন্তু আশা ও আকাঙ্ক্ষা এই যে ব্রাহ্মসমাজ গুরুবাদ গ্রহণ করিয়া আপনার সিংহাসনে আপনি প্রভাব বিস্তার করিবে। এই অপূর্ণতা বিদূরীত করিবার জন্যই গোঁসাইজীকে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল, একার্য্য অন্য কোন বাহিরের লোকের দ্বারা হইত না।

গোস্বামী মহাশয়ের উপদেশ।

তিনি সাধনাকে পঞ্চস্তরে বিভক্ত করিয়াছেন যথা,—(১) নীতি (২) ধর্ম্ম (৩) ব্রহ্মজ্ঞান (৪) যোগ ও (৫) লীলা। যেমন পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় লইয়া দেহ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় লইয়া মন, সেইরূপ এই পঞ্চস্তর লইয়া

ধর্ম্ম। ধর্ম্মকে যদি একটী বৃক্ষ স্বরূপ বলা যায় তবে নীতি উহার মূল স্বরূপ, ধর্ম্মাচার উহার কাণ্ড, ব্রহ্মজ্ঞান শাখা, যোগ উহার ফুল এবং লীলা উহার ফল। নীতি না থাকিলে ধর্ম্মই হয়না, কিন্তু নীতি থাকিলেই যে ধর্ম্ম হইল তাহা নহে। উক্ত পঞ্চাঙ্গের যে কোনও অঙ্গের অভাবে একেন্দ্রিয়হীন দেহের ন্যায় ধর্ম্ম অপূর্ণ রহিল।

ধর্ম্মের গভীরতা।

গোস্বামী মহাশয়ের কোন মন্ত্রশিষ্যার যখন ১৮ ঘণ্টা নাম-সমাধি হইল তখন বলিলেন যে, এখনও ঈশ্বর-বিশ্বাস জন্মে নাই। নামানন্দে নখাগ্র হইতে কেশাগ্র পর্য্যন্ত অমৃতময় হইয়া গিয়াছে। এই অমৃত চুসিয়া চুসিয়া আত্মা নিষ্পাপ হইবে, তখন "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" আপনি প্রাণে প্রকাশিত হইবেন। তখন তাঁহার (সেই সাধকের) মুখ হইতে যাহা বাহির হইবে তাহারই নাম শাস্ত্র, সে যে আচরণ করিবে তাহারই নাম ধর্ম্ম।" ("মনোরমার জীবন-চিত্র" দ্রষ্টব্য।) এই উপদেশেই গোস্বামী মহাশয়ের প্রচারিত ধর্ম্মের গভীরতা কিছু কিছু উপলব্ধ হইবে।

সাধন-প্রণালী।

সদ্‌গুরুর নিকট সিদ্ধ-মন্ত্র গ্রহণ এবং প্রতি শ্বাস প্রশ্বাসে সেই নাম যপের চেষ্টা, নির্দ্দিষ্ট প্রকারের প্রাণায়াম সাধন ইহাই তাঁহার প্রদত্ত সাধন প্রণালী। প্রাণায়াম ভূত শুদ্ধির জন্য, নাম যপই প্রধান সাধন।

গোস্বামী মহাশয়ের প্রদত্ত সাধন প্রণালীতে মাংস ও ডিম্ব ভক্ষণ এবং উচ্ছিষ্ট ভোজন নিষিদ্ধ। পিতা মাতা স্বামী ও গুরুর উচ্ছিষ্ট প্রসাদ-স্বরূপ, উহা কল্যাণকর এবং অন্য কোন ভক্তিভাজনের উচ্ছিষ্টে প্রসাদ-জ্ঞান জন্মিলে তাহাও অগ্রাহ্য নহে।*

* আমার লিখিত "প্রসাদী [illegible]" এই বিষয়ের বিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে।

কোনও প্রকার কাল্পনিক সাকার কি নিরাকার চিন্তা অনাবশ্যক। যাহা প্রকাশিত হইবার তাহা আপনি ফুটিয়া উঠিবে। মন্ত্রই বীজ, সেই বীজ হইতে ধর্ম্ম ফুটিবে, কল্পনার আবশ্যকতা নাই।

অসাম্প্রদায়িকতা।

গোস্বামী মহাশয়ের সাধন-প্রণালীতে কোন ও সাম্প্রদায়িকতা নাই। গৃহী, সন্ন্যাসী, উদাসী, হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, খৃষ্টান সকলেই এই সাধন প্রণালী গ্রহণ করিতে পারেন। ইন্দ্রিয় দমন, চিত্ত সংযম, ধ্যান, ধারণা, সমাধি ও ভক্তিই এই সাধনার লক্ষ্য ; এবং ভগবান্‌ই চরম লক্ষ্য। এই প্রণালী অবলম্বন করিতে কাহারও স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হয় না। তাঁহার ধর্ম্মে কোন সামাজিক দলাদলী নাই, সকল সম্প্রদায়ের মোক্ষ-প্রয়াসী নরনারীই এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন। তাঁহার নাম করিয়া একটী দলের সৃষ্টি হয়, ইহা তাঁহার অভিপ্রেত ছিলনা।

ব্রাহ্ম-সমাজের পূর্ণ উদ্যমের সময় গোস্বামী মহাশয়ের কার্য্য কিরূপভাবে গৃহীত হইয়াছে, ব্রাহ্ম-সমাজের অদ্বিতীয় নেতা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের একখানা পত্র দেখিলেই তাহার আভাস পাওয়া যাইবে। উক্ত পত্র "ধর্ম্মতত্ত্বে" প্রকাশিত হইয়াছিল।

কেশবচন্দ্রের পত্র।

"জয় জগদীশ।

প্রীতিপূর্ণ অসংখ্য নমস্কার,—

জয় জয় বিজয়ের জয়। তুমি যে জয় পতাকা ধারণ করিয়া রহিয়াছ তাহা এখান হইতেই দেখিতেছি। তোমার উৎসাহের তরঙ্গ এখানে আসিয়া আমার মনকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। তোমার হৃদয়ে ঈশ্বর যে জ্বলন্ত অগ্নি রাখিয়াছেন, তদ্দ্বারা তুমি যে ভ্রম ও কুসংস্কার

একেবারে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি? আবার বলি জয় জয়। ব্রাহ্মধর্ম্মের মহিমা এতদিন সত্যপরায়ণ প্রচারকের অভাবে প্রচ্ছন্ন ছিল, এখন সেই মহিমা প্রকাশিত হইতেছে। আর আমাদের ভয় কি? ঈশ্বরকে একমাত্র নেতা জানিয়া উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার নাম প্রচার কর; বৈরাগী হইয়া সংসারকে পদানত কর; উৎসাহের দ্বারা সকলকে জাগ্রত কর। প্রীতিসূত্রে সকলকে বদ্ধ কর এবং দেশবিদেশ জয় করিয়া আমাদের রাজ্য বিস্তৃত কর। এবং তোমার সঙ্গতের দরিদ্র ভ্রাতাদিগকে সম্রাট অপেক্ষা ধনবান কর। আমরা আশাপূর্ণ হৃদয়ে তোমার প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া রহিয়াছি। তুমি যত প্রচার করিবে ততই আমাদের ঐশ্বর্য্য ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইবে। ভাল, একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি এত স্বার্থপর কেন? ঢাকাতে যে সকল অমূল্য রত্ন ঢাকা ছিল, তাহা কি কেবল আপনি গ্রহণ করিবে? আমাকে কি একবারও ডাকিতে নাই? নিতান্ত দরিদ্রভাবে এখানে পড়িয়া আছি। তোমার উৎসবে কি আমাকে অংশী হইতে দিবেনা? আমার কি ঢাকায় যাইবার কোন সুবিধা নাই? তুমি না পথ দেখাইয়া দিলে আমার অগ্রসর হইবার যো নাই।

কলিকাতা কলুটোলা—
২৪শে মাঘ ১৭৮৬ শক

অভিন্নহৃদয়—
শ্রীকেশব চন্দ্র সেন"।

গোস্বামী মহাশয়ের ব্রাহ্ম-সমাজ পরিত্যাগের বহুবৎসর পরে (১২৯৮ সনের অগ্রহায়ণ মাসে) একদিন তিনি কয়েকজন হিন্দু ও ব্রাহ্ম-শিষ্য ও ব্রাহ্ম-প্রচারক ৺ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া ব্রাহ্ম-সমাজের প্রধান আচার্য্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে দর্শন

করিতে গিয়াছিলেন। গোঁসাইজী তাঁহার চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলে, ঠাকুর মহাশয়

"নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গো-ব্রাহ্মণ হিতায়চ,
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।"

এই শ্লোকটী উচ্চারণ করিয়া প্রতি-নমস্কার করিলেন।*

কিঞ্চিৎ কথোপকথনের পরে মহর্ষি বলিলেন, "যাঁহাদের হৃদয়ে প্রেম, তাঁহাদের কথা অন্তর স্পর্শ করে নতুবা কথা উপরে উপরে ভাসিয়া যায়। তুমি যাহা বলিলে তাহাই ঠিক, তাহাই সত্য। আমার অন্তরের কথা কাহাকেও বলিনা, কেহ উহা বুঝেনা। তুমি বুঝ তাই তোমাকে বলি। ঈশ্বরকে যেমন ভাবে চাই, তেমন ভাবে এখনও পাই নাই, বিদ্যুতের ন্যায় দেখা দিয়া অদৃশ্য হন, প্রাণ আমার ধড় ফড় করে (মহর্ষির ক্রন্দন)। জ্ঞানের দ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায় না। জ্ঞান কেবল কথার কথা। প্রেম-ভক্তিই তাঁহাকে পাবার একমাত্র উপায়। জন্ম, সঙ্গ, শিক্ষা, ও সাধন এই চারিটী একসঙ্গে না থাকিলে ঠিকমত ধর্ম্মলাভ হয় না। তোমাতে এই চারিটী উপযুক্তরূপে আছে। তুমি ঠিক ধর্ম্মলাভ করিয়াছ। এখন তুমি যাহাই কেন করনা পরমেশ্বর তাহাই অতি সুন্দর দেখিতেছেন। (শিষ্যদের প্রতি) গোঁসাইকে তোমরা কখন ছাড়িও না, ধরিয়া থাকিও। ইনি তোমাদিগকে অনন্ত উন্নতির পথে লইয়া যাইবেন, তোমাদের মঙ্গল হউক। (গোস্বামী

* শ্রীযুক্ত বঙ্কবিহারী কর মহাশয় তাঁহার কৃত "মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী" নামক গ্রন্থে অন্যান্য কথা লিখিয়া এই শ্লোকটীর উল্লেখ করেন নাই। একটী সংস্কৃত শ্লোক উচ্চারণ করিয়া মহর্ষি প্রতি নমস্কার করিয়াছিলেন, তিনি এইটুকু মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন। বোধ হয় ব্রাহ্ম গ্রন্থকারের মনে কিছু আশঙ্কার উদয় হইয়াছিল, কিন্তু আমরা মনে করি যে প্রকৃত ঘটনা ব্যক্ত থাকাই ভাল ; দেবেন্দ্রনাথ যে অবতার বাদ মানিতেন না ইহা সকলেই জানেন। তিনি কি ভাবে এই শ্লোক ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা ভাবিবার বিষয়।

মহাশয়কে) তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতে পারিনা, তোমাকে শ্রদ্ধা করি।" ইহাতে গোস্বামী মহাশয় বলিলেন,

"আপনিত আমার গুরু, আপনা হইতেই আমার সব"। মহর্ষি বলিলেন, "পাঠশালার গুরুর শিক্ষাধীনে থাকিয়া ছাত্র পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি লাভ করে। তখন পাঠশালার গুরুকে গুরু বলিলে যেরূপ হয় ইহা সেইরূপ হইতেছে।" (বঙ্ক বাবুর "মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী" হইতে উদ্ধৃত।)

সিদ্ধপীঠ দক্ষিণেশ্বরের ভগবান্ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিয়াছেন— "বাপ ওরূপ না হলে ছেলে ভক্ত হয় না, দেখনা বিজয়ের বাপ ভাগবত পড়তে পড়তে অজ্ঞান হয়ে যেত। + + আজকাল বিজয় যা সব (ঈশ্বরীয় রূপ) দর্শন করছে সব ঠিক ঠিক। সাকার নিরাকারের কথা বিজয় বল্লে যেমন বহুরূপীর রং, কাল, লাল, নীল, সবুজ ও হচ্ছে আবার কোন রং নাই। কখন সগুণ কখন নির্গুণ। + + + বিজয় বেশ সরল, খুব উদার, সরল না হইলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। বিজয় কাল অধর সেনের বাড়ীতে গিছ্লো, তা যেন আপনার বাড়ী, সব্বাই যেন আপনার। বিষয় বুদ্ধি না গেলে উদার সরল হয় না। × + + মাটি পাট করা না হলে হাঁড়ি তৈয়ার হয় না। ভিতরে বালি ঢিল থাকলে হাঁড়ি ফেটে যায়। তাই কুমোর আগে মাটি পাট করে। আরসিতে ময়লা পড়ে থাকলে মুখ দেখা যায় না। চিত্তশুদ্ধি না হলে স্ব-স্বরূপ দর্শন হয় না। দ্যাখনা, যেখানে অবতার সেইখানেই সরল। নন্দঘোষ, দশরথ, বসুদেব এঁরা সব সরল। বেদান্তে বলে শুদ্ধ-বুদ্ধি না হলে ঈশ্বরকে জানতে ইচ্ছা হয় না। শেষ জন্ম যাঁ অনেক তপস্যা না থাকলে উদার সরল হয় না"। (কথামৃত ৪র্থ ভাগ বিংশখণ্ড)। গোস্বামী মহাশয় গুরু গ্রহণের পরে গয়ার

সাধনক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে দেখিয়া পরমহংসদেব বলিলেন, "দেখ বিজয়ের এতদিন ফোয়ারা চাপা ছিল, এইবার খুলে গেছে।" (কথামৃত ১মভাগ)

আদি ব্রাহ্ম সমাজের সভাপতি দেবগৃহ প্রবাসী জ্ঞানবৃদ্ধ ৺রাজ-নারায়ণ বসু মহাশয় লিখিয়াছিলেন,—"(গোস্বামী মহাশয়) যে একদিন এখানে ছিলেন তাঁহার সহবাসে কি পর্য্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম তাহা বলিতে পারিনা। তাঁহার সহিত ছাড়াছাড়ি হইবার সময় কষ্ট হইতে লাগিল। × × × × × আমি তাঁহাকে একজন প্রকৃত সাধুপুরুষ বলিয়া মনে করি। মত বিভেদ সত্ত্বেও আমি ঐরূপ জ্ঞান করি।" (বঙ্ক বাবুর 'মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী')

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রসিদ্ধ প্রচারক পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন—"ব্রাহ্মধর্ম্ম আর কি প্রচার করিব, গোঁসাইজীকে একটি আসনে করিয়া লইয়া দেখাইলেই হইল যে, এই দেখ আমাদের ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম।" নববিধান সমাজের প্রচারক পৃথিবী-বিখ্যাত বক্তা শ্রীযুক্ত প্রতাপ-চন্দ্র মজুমদার, ডাক্তার পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (Dr. P. C. Chatterjee.) মহাশয়ের পাটনার ভবনে একদিন ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মভাবের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হইয়া বলিয়াছিলেন—"আমার মনে হয় ধর্ম্মের জন্য একেবারে ক্ষ্যাপা হইয়াছে ব্রাহ্ম সমাজে এরূপ লোকের অভাব হইয়াছে। এরূপ লোক আমি দেখিনা। একটী লোক দেখিয়াছিলাম তিনি সাধু বিজয়কৃষ্ণ। আমি তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মের জন্য ব্যাকুলাত্মা দেখি নাই"। ('মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী'—বঙ্ক বাবুর)

সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের জ্ঞানী ও ভক্ত প্রচারক ৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় "মহাত্মা বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী" পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"গোস্বামী মহাশয়ের জীবন আলোচনা করিলে তাঁহার

অসাধারণ মহত্ত্ব অনুভব করিয়া হৃদয় উন্নত ও পবিত্র হয়। × × × গোস্বামী মহাশয়ের নিষ্কলঙ্ক নির্ম্মল জীবন, তাঁহার সরলতা, সত্যনিষ্ঠা, প্রবল ধর্ম্মতৃষ্ণা, জীবের প্রতি একান্ত হিতৈষণা, তাঁহার সুগভীর ও সুপ্রশস্ত প্রেমভক্তি, পরমেশ্বরকে লাভ করার জন্য পর্ব্বত প্রমাণ বাধা বিঘ্ন উল্লঙ্ঘন, তাঁহার চরিত্রের এই সকল মহত্ত্ব ও আরও অনেক সদ্‌গুণ আলোচনা করিলে লোকে নিশ্চয়ই যথেষ্ট উপকার লাভ করিবেন"।

উপরিলিখিত অভিমতগুলি আমি গোস্বামী মহাশয়ের চরিত্রের ও সাধুতার সার্টিফিকেট স্বরূপ উপস্থিত করি নাই। বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাঁহারা তাঁহার জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ট-সম্বন্ধে আসিয়াছেন এবং কার্য্য ক্ষেত্রে যাঁহাদের সহিত তাঁহার মতান্তরও ঘটিয়াছে, তাঁহারাও তাঁহাকে কিরূপ চক্ষে দেখিয়াছেন তাহাই দেখাইলাম। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ৺উমেশচন্দ্র দত্ত ৺কালীনাথ দত্ত প্রভৃতি প্রবীণ ব্রাহ্মগণের গোঁসাইজীর প্রতি অবিচলিত প্রীতি শ্রদ্ধাভক্তি ছিল। আরও কত ধর্ম্মার্থী ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকার তাঁহার প্রতি অচলা ভক্তি ছিল এবং এখনও আছে তাঁহাদের নাম লিখিতে গেলে শত শত নাম লিখিতে হয়।

আমাদের বর্ত্তমান সভ্যতা ও সাধনা, প্রাচীন সভ্যতা ও সাধনার খাঁটি বংশধর নহে, এটী দেশান্তর হইতে আনিত পোষ্যপুত্র। ইহার তর্পণ করিয়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষের তর্পণ করা হয় না। ভারতীয় সভ্যতার অভিব্যক্তির ক্রমানুসারে আমরা ইহাকে প্রাপ্ত হই নাই, কাজেই ধড়ে মুণ্ডে জোড়া লাগিতেছে না। ভারতীয় সভ্যতা ও সাধনার ধারার মাঝখানে যে ফাঁক পড়িয়া গিয়াছে, এই ফাঁক পূর্ণ করার জন্য যিনি বিচ্ছিন্ন ধড়ে-মুণ্ডে জোড়া দিয়া জীবন-সঞ্চার করিতে পারেন এমন এক-জন সিদ্ধ মহাপুরুষের প্রয়োজন ছিল। গোস্বামী মহাশয় এই প্রাচীন ওনবীনের মিলন করিয়াছেন। তিনি প্রাচীন সাধনার সঙ্গে নবীনকে

পরিচয় করাইয়া দিয়াছেন। আজি যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মহাপুরুষদিগের সঙ্গে বাঙ্গালা দেশের সাধু ও সাধকদিগের ঐকান্তিক মিলন ঘটিয়াছে, নবীন প্রাচীনের অনুগামী হইতেছে, গোস্বামী মহাশয়ই ইহার প্রধান কারণ। আজি যে প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র ধর্ম্মার্থি-বাঙ্গালী ভারতবর্ষের বিভিন্ন দেশের মহাপুরুষগণের কৃপালাভ করিতেছেন, গোঁসাইজীই ইহার প্রবর্ত্তক ও নিয়ামক। এক দিকে তিনি সেই সমস্ত মহাপুরুষকে বঙ্গ-সমাজের পরিচিত করিয়াছেন, অন্য দিকে বাংলা দেশের পরমহংস ও ব্রহ্মচারী প্রভৃতি মহাপুরুষদিগের সংবাদ তিনি বিদেশী মহাপুরুষদিগের নিকট কীর্ত্তন করিয়াছেন। এটী যে কত বড় কাজ তাহা ভাবুকগণ বুঝিতে পারিবেন। আমি পশ্চিমের সাধুদিগের মুখে শুনিয়াছি যে, বঙ্গভূমি বড়ই ভাগ্যবতী, কেন না সেখানে রামকৃষ্ণ ও বিজয়কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। গোস্বামী মহাশয়ের প্রয়াগধামে কুম্ভমেলায় অবস্থান হইতেই বঙ্গদেশের সহিত সমগ্র ভারতের সাধুদিগের সৌহ্রাদ্য-বন্ধন দৃঢ়ীভূত হইয়াছিল। এখন ভারতের বিবিধ সম্প্রদায়ের সাধু ও সাধকগণ পরস্পর "আপনার জন" হইয়া গিয়াছেন। আমাদের "জাতীয় মহাসমিতির" মিলন অপেক্ষাও এই মিলন অধিকতর সুখকর ও শুভকর হইয়াছে, অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেরই তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুমাত্র কারণ নাই। যাঁহারা এই মহামিলনের সংবাদ রাখেন না তাঁহারা এ দেশের সর্ব্বপ্রধান শুভকর কার্য্য সম্বন্ধে একান্তই অনভিজ্ঞ।

ভারতবর্ষের সমস্ত সম্প্রদায়ের মহাপুরুষবর্গ, বৈষ্ণবগণ, ও ফকীরগণ গোস্বামী মহাশয়কে শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন ও ভালবাসিতেন। যখন যে দেশে তিনি গিয়াছেন সেইখানেই সাধু ও ভক্তগণ আপনার লোক জানিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছেন। বাঙ্গালীর সাধন-গৌরব

তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া সমস্ত ভারতবর্ষে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণ ও ভারতবর্ষের সকল সম্প্রদায়ী সাধু, সন্ন্যাসী, যোগী, উদাসী, ফকীর এবং পন্থিগণের আপনার জন হইয়াছেন।

বাঙ্গলাভাষায় গোস্বামী মহাশয়ের চারি খানি জীবনচরিত বাহির হইয়াছে, এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় "সদ্‌গুরুসঙ্গ" নাম দিয়া তাঁহার একবৎসরের রোজনামচা (ডায়রী) অবলম্বনে একখানি মনোহর গ্রন্থ বাহির করিয়াছেন, উহাতে তিনি তাঁহার গুরুদেবের (গোস্বামীমহাশয়ের) যে সকল উপদেশ ও কথা প্রচারিত করিয়াছেন, তাহা সকল শ্রেণীর ধর্ম্মার্থীর পক্ষেই পরম উপকারী হইয়াছে। সে পুস্তকখানি হইতে কোন উপদেশই উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না কেননা এই গ্রন্থের কলেবর বাড়িয়া গিয়াছে। তবে সংক্ষিপ্ত কথা এই যে, (১) সদ্‌গুরুলাভ করা একান্ত কর্ত্তব্য (২) সত্যরক্ষা ও শুক্ররক্ষা করিতে হইবে (৩) সরলতা ও ভালবাসা প্রধান সাধন (৪) পরনিন্দা, পরচর্চ্চা এবং আত্মপ্রশংসা একান্ত পরিত্যজ্য (৫) বুজরুগী করিলে ধর্ম্মনষ্ট হয় (৬) ঈশ্বর সাকার নিরাকার যে কোনরূপে প্রকাশিত হইতে পারেন তিনি অরূপ এবং বিশ্বরূপ (৭) সাধনকালে স্ত্রীলোক পুরুষ হইতে এবং পুরুষ স্ত্রীলোক হইতে স্বতন্ত্র থাকিবে (৮) অতিথিসেবা ও সাধুসেবা গৃহস্থের ধর্ম্ম, কিন্তু কোন অপরিচিত সাধুকে পরিবারের মধ্যে স্থান দিবে না (৯) কাম নিবৃত্তি হইলে সমুদয় দেহ মন অমৃতময় হইয়া যায়, বিষ্ঠা মুখে গেলে যেমন বিরক্তি ও ঘৃণা জন্মে, তখন সকল প্রকার পাপের প্রতি সেইরূপ বিরক্তি ও ঘৃণা উৎপন্ন হয়, ভেবেচিন্তে পাপত্যাগ করতে হয় না (১০) প্রত্যেক শ্বাস প্রশ্বাসে গুরুদত্ত নাম যখন চলে তখন আর ভয় থাকেনা (১১) নামে অরুচি হলে নামই তাহার ঔষধ (১২) স্ত্রীকে

স্বামী ভগবতী এবং স্বামিকে স্ত্রী মহাদেব জ্ঞান করিয়া সাধন করিবে, ইত্যাদি। স্থধু কথা নহে এই সকল সাধণের প্রণালীও প্রদর্শিত হইয়াছে।

পুরুষোত্তম যাত্রা।

কুম্ভমেলার পরে গোস্বামী মহাশয় সশিষ্য নবদ্বীপ গিয়াছিলেন। সেখানে নবদ্বীপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্মার্ত্ত-পণ্ডিত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পুত্র তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। গোঁসাইজী যেখানে যাইতেন সেইখানেই আনন্দবাজার ও প্রেমের হাট বসিত। শ্রীপুরুষোত্তম ধামে তিনি তাঁহার শেষ-জীবন অতিবাহিত করেন। ৪৫নং হেরিসন রোডের বাড়ী হইতে তিনি পুরুষোত্তম যাত্রা করেন। একখানা ছোট ষ্টীমার ভাড়া করিয়া তাহার সঙ্গে দুই খানি বোট জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। অনেক অনুগত স্ত্রীপুরুষ তাঁহার সহযাত্রী হইয়াছিলেন।

পুরুষোত্তমের পথে।

গোঁসাইজী যখন গঙ্গার ঘাটে উপস্থিত হইলেন, তখন শিষ্যগণ গাড়ী হইতে ষ্টীমার পর্য্যন্ত সমস্ত রাস্তায় তাঁহাদের গাত্র-বস্ত্র পাতিয়া দিলেন, তিনি অনুগতগণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়া সেই সকল বস্ত্রের উপর চরণ-কমল অর্পণ করিতে করিতে ষ্টীমারে উঠিলেন। ষ্টীমার ছাড়ার সময় হইয়াছে, কিন্তু তাঁহাকে ছাড়িয়া কেহই উঠিতে পারিতেছেন না; এমন সময় গোঁসাইজী দণ্ডায়মান হইয়া করজোড়ে কোন একজন শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"আপনারা আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন।" সেই শিষ্য

সজলনয়নে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাকে আমরা কি বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিব ?" তিনি বলিলেন, " এই আশীর্ব্বাদ করুন, জগন্নাথদেব যেন আমাকে গ্রহণ করেন"। এই কথায় শিষ্যবর্গের মধ্যে ক্রন্দনের রোল পড়িয়া গেল। একজন ভক্ত মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। এইভাবে গুরুদেবকে বিদায় দিয়া শিষ্যবর্গ শূন্য-হৃদয়ে ঘরে ফিরিলেন, যাঁহারা তাহার সঙ্গী হইলেন, তাঁহাদের আনন্দের সীমা রহিল না।

ষ্টীমার যখন কেনাল-পথে যাইতেছিল, একদিন কতকগুলি ভিখারী বালক পয়সার জন্য ষ্টীমারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। গোঁসাইজীর আজ্ঞানুসারে ষ্টীমার হইতে তাহাদিগকে পয়সা ছুড়িয়া দেওয়া হইল। কয়েকটী লোক পয়সা পায় নাই, তাহারা পেছনে পড়িয়াছে, গোঁসাইজী বলিলেন, "আহা, ইহারা পাইলনা ?" তৎক্ষণাৎ বীর-ভক্ত শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ ঘোষ চলন্ত-ষ্টীমার হইতে লম্ফ দিয়া জলে পড়িলেন এবং সাঁতারিয়া তীরে উঠিয়া সেই ভিখারীদিগকে পয়সা বিতরণ করিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন। যে গুরুর ইচ্ছা পালনের জন্য শিষ্য অম্লান-বদনে জীবনকে তুচ্ছজ্ঞান করিতে পারে, তিনি কিরূপ স্নেহডোরে শিষ্যগণকে বাঁধিয়াছেন, ভাবিবার বিষয়।

কলিকাতা হইতে শ্রীক্ষেত্র পৌঁছছা পর্য্যন্ত গোঁসাইজীকে লইয়া যাত্রিগণ যেরূপ আনন্দ সম্ভোগ করিলেন, তাহার বর্ণনা হয়না। সকলেই দিবারাত্রি তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়া ভগবৎ-ভক্তিতে ডুবিয়া-ছিলেন।

তাঁহার ভাব, ভক্তি, আচার, আচরণ, দয়া ও বদান্যতা দেখিয়া পুরীর লোকেরা মুক্তকণ্ঠে বলিলেন যে, তিন চারি শত বৎসরের মধ্যে (অর্থাৎ মহাপ্রভুর পরে) পুরীধামে এরূপ মহাপুরুষের আগমন ঘটে নাই। সেখানকার সাধুগণ তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন "জটিয়া

বাবা।" আমরাও এখন হইতে এই প্রবন্ধে তাঁহাকে "জটিয়া বাবা" বলিব।

বানর-বধ-নিবারণ।

জটিয়া বাবার ৮ পুরীধামে অবস্থান কালে তথাকার মিউনিসিপালিটি বানর-বধের ব্যবস্থা করিলেন। বানরগণ গৃহস্থদিগের অনিষ্ট করে, এই অজুহত দেখাইয়া বানর-বধের আদেশ করা হইল এবং অবাধে এই নৃশংস-ব্যাপার সংসাধিত হইতে লাগিল।

একদিন মিউনিসিপালিটীর নিযুক্ত এক শিকারী একটা বানরকে গুলি করিয়া মারিয়াছে, উহার মৃতদেহ রক্তাক্ত হইয়া রাস্তায় পড়িয়া আছে, বানর-পত্নী সভয়ে দূর হইতে উঁকি-ঝুঁকি মারিয়া সেই মৃতদেহ দেখিতেছে, ভয়ে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। জটিয়া বাবা এই দৃশ্য দর্শন করিয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া ফুকারিয়া ফুকারিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ইহার পরে বাসায় আসিয়া বানর-বধের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে শিষ্যগণকে আদেশ করিলেন। শিষ্যগণ ইংরাজী, বাঙ্গালা, সমস্ত সংবাদপত্রে টেলিগ্রাম করিয়া ও প্রবন্ধ লিখিয়া ঘোর আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। এই কার্য্যের জন্য তাঁহারা অর্থ ও সামর্থ ব্যয়ে বিন্দুমাত্র কৃপণতা করিলেন না।

এই আন্দোলনের ফলে মিউনিসিপালিটী এইরূপ মন্তব্য প্রকাশিত করিলেন যে, বানর-বধ শাস্ত্র বিরুদ্ধ কার্য্য কিনা তদ্বিষয়ে পণ্ডিতদিগের মত সংগ্রহ করা হইবে। সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিত জটীয়া বাবার সন্ন্যাসি-শিষ্য স্বামী দেবপ্রসাদ সমস্ত শাস্ত্র আলোচনা করিয়া বানর-বধের বিরুদ্ধে একখানি পাতি লিখিলেন, সেই পাতিতে কাশী, মিথিলা, দ্রাবিড় এবং নবদ্বীপ, ভাটপাড়া, বাকলা ও বিক্রমপুরের

সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ এবং সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকগণ যোগদান করিলেন। কিন্তু কার্য্যকালে মিউনিসিপালিটী কয়েকজন অনুগত উড়িয়া পণ্ডিতের প্রদত্ত বিরুদ্ধ-পাতি উপস্থিত করিয়া আপনাদের জেদ বজায় রাখিলেন। পুনরায় অধিকতর আগ্রহের সহিত বানর-বধ কার্য্য চলিতে লাগিল।

এই কার্য্যে সমুৎসাহী মিউনিসিপালিটীর এক প্রধান ব্যক্তি (একজন বিখ্যাত উকীল) বলিলেন যে, বানর এবং সাধু এই উভয়ই জঞ্জাল (Nuisance); এই উভয়কেই বধ করা উচিত। ইহাতেই বুঝা যায় যে জটীয়া বাবা একটী অসৎ কার্য্যে বাধা দেওয়ায় এক শ্রেণীর "শিক্ষিত" আখ্যাধারী লোকের কিরূপ বিদ্বেষ-পাত্র হইয়াছিলেন।

এই সময় অনেক বানর জটিয়া বাবার আশ্রয় গ্রহণ করিল, অনায়াসে তাহারা আপনাদের বন্ধু চিনিয়া লইল। বানর ও বানরীগণ তাঁহার আবাসে ও আসনের নিকট বাস করিতে লাগিল। তাহারা বুঝিয়াছিল ইহাই তাহাদের অভয়ধাম। তিনি অতি যত্নে তাহাদিগকে আহার দিতেন, এবং নানা প্রকার নাম ধরিয়া তাহাদিগকে ডাকিতেন।

মিউনিসিপালিটীর আচরণে সকলেই মনে করিয়াছিল, অচিরে পুরীধামে বানরবংশের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে কিন্তু ভক্তবৎসল ভগবান তাঁহার ভক্তের হৃদয়-বেদনায় উপেক্ষা প্রদর্শন করিলেন না, জটিয়া বাবার চক্ষের জল বিফল হইল না। কিছুদিন পরে তথনকার ছোটলাট উড্‌বরণ সাহেব মফঃস্বল পরিদর্শনার্থ পুরীধামে উপস্থিত হইলেন এবং অযাচিতরূপে বানর-বধ বন্ধ করিয়া দিলেন। ছোটলাটের এই কার্য্যে জটীয়া বাবার এবং তাঁহার শিষ্যবর্গের হৃদয়ের ভাব কিরূপ হইল তাহা কে বর্ণনা করিতে পারে? সমস্ত সজ্জনের মুখে "ভক্তের জয়" এই ধ্বনি বিঘোষিত হইতে লাগিল।

মন্দিরের কার্য্যে বিশৃঙ্খলা।

জগন্নাথদেবের সেবা সম্বন্ধে তখন বড়ই বিশৃঙ্খলা চলিতেছিল। সেবাইত ও পাণ্ডাগণ নিজ স্বার্থই দেখিতেন, জগন্নাথের সেবার দিকে দৃষ্টি রাখিতেন না। এমন অনেক দিন গিয়াছে যে, সমস্ত দিন জগন্নাথের ভোগ দেওয়া হয় নাই। জটীয়া বাবা ইহাতে অত্যন্ত মর্ম্মবেদনা পাইলেন। একদিন কাঁদিয়া বলিলেন, "হাজার হাজার লোক প্রসাদ পাইতেছে না, জগন্নাথদেব উপবাসী থাকিয়া ঘরে ঘরে ভিক্ষা মাগিতেছেন।" যাহাতে জগন্নাথের সেবার সুশৃঙ্খলা ঘটে সেজন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন, ভগবানের কৃপায় অল্পদিনের মধ্যেই নূতন ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়া মন্দির সংক্রান্ত সমস্ত বিশৃঙ্খলার প্রতিবিধান করিলেন।

পট্টডুরী প্রদান।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু বর্দ্ধমানের অন্তর্গত কুলীনগ্রামের বসু-বংশীয় বসু রামানন্দ নামক ভক্তের দ্বারা জগন্নাথের "পট্টডুরী" দেওয়াইয়াছিলেন, সেই হইতে এই নিয়ম চলিয়া আসিয়াছে যে, কুলীনগ্রামের বসু-বংশীয় কেহ পট্টডুরী প্রদান করিবেন, তাহাই জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার অঙ্গে বেষ্টন করিয়া "পহুণ্ডি" করা হইবে, অর্থাৎ রত্নবেদী হইতে নামান হইবে। বহুকাল কুলীনগ্রামের কেহই পট্টডুরী প্রদান করেন নাই, পুরাতন ডুরীর কিছু কিছু ছিন্ন অংশ বাঁধিয়া নিয়ম রক্ষা করা হইতেছিল। জটীয়া বাবা তাঁহার মন্ত্রশিষ্য কুলীনগ্রামের বসু-বংশীয় বোলপুরের উকীল শ্রীযুক্ত হরিদাস বসু মহাশয়কে পট্টডুরী প্রদান করিতে আদেশ করিলেন। পট্টডুরী অর্থ রেশমের দড়া—এই ডুরী প্রস্তুত করার বিশেষ প্রণালী

আছে। যাহারা বংশানুক্রমে ডুরী প্রস্তুত করিত, তাহারা বহুকাল ইহা প্রস্তুত করে নাই। বসুমহাশয় বহু অনুসন্ধানে কোন এক বৃদ্ধের নিকট ডুরী প্রস্তুতের প্রণালী অবগত হইয়া নিজের হাতে উহা প্রস্তুত করিয়া দিলেন। এই ডুরী প্রস্তুত করিতে প্রায় দুইশত টাকা খরচ পড়িল। এখন হরিদাস বসু মহাশয়ের প্রদত্ত পট্টডুরী পরিয়াই জগন্নাথদেব ভ্রাতা ও ভগিনী-সহ রথারোহণ করিয়া থাকেন।

দান মহোৎসব।

জটীয়া বাবার আশ্রমে অনবরতই দয়ার স্রোত বহিতেছিল। তিনি কপর্দ্দকশূন্য, নানাস্থান হইতে শিষ্যগণ স্বপ্রণোদিত হইয়া যাহা পাঠাইতেন প্রতিদিনই তাহা নিঃশেষ হইয়া যাইত, কল্যকার জন্য চিন্তা করা হইত না। একদিন তিনি বলিলেন যে, জগন্নাথদেব আদেশ করিয়াছেন, ৺পুরীধামে কাঙ্গাল গরীব সাধু সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যে কেহ আসিবে সকলকেই পরিতৃপ্ত করিয়া ভোজন করাইতে, দক্ষিণা দিতে এবং প্রয়োজনানুরূপ লোটা কম্বল ও বস্ত্র বিতরণ করিতে হইবে। কপর্দ্দকশূন্য সন্ন্যাসীর উপর ভগবানের কি অদ্ভুত আদেশ! এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে অন্যূন ত্রিশহাজার টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। ভগবানের আদেশ না পাইলে কোন্ অর্থহীন ব্যক্তি এরূপ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারে?

দীনবন্ধু নামে এক কাপুড়িয়া আছেন, তাঁহার দোকান খুব বড় ছিল না; তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়া জটীয়া বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এই কার্য্যে যত বস্ত্র লাগিবে তাহা দীনবন্ধু সরবরাহ করিতে সাহস করেন কিনা? দীনবন্ধু যেন দীনবন্ধু দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই তৎক্ষণাৎ এই

অসীম-সাহসিক কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু এই কার্য্যে তাঁহার ভ্রাতা যোগ দিতে অস্বীকৃত হইয়া দোকান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। দীনবন্ধুকে জটীয়া বাবা বলিলেন, "দেখ আমি কপর্দ্দকশূন্য সন্ন্যাসী, আমার কাছে পাওয়ার প্রত্যাশা কিছুই নাই। স্বয়ং জগন্নাথদেব দান করিতেছেন, ইহা বিশ্বাস করিয়া যদি তুমি দিতে পার, তবে দিবে"। দীনবন্ধু বলিলেন, "আপনার আজ্ঞা হইলেই আমি দিতে পারিব।" এইরূপ ঘটীওয়ালা, কম্বলওয়ালা এবং মুদী প্রভৃতি অন্যান্য যে যে দোকানদারকে ডাকিয়া জটীয়া বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, সকলেই আনন্দের সহিত জিনিস পত্র দিতে রাজি হইল।

লেংটীপরা শিষ্য সরলনাথ গুহের নামে খরচ লিখিয়া দোকানদারগণ সহস্র সহস্র টাকার জিনিস দিতে লাগিল। সরলনাথ যে দোকানে যেরূপ দ্রব্য যে পরিমাণ দেওয়ার জন্য চিঠি কাটিতেছেন, অম্লান বদনে দোকান-দারগণ তাহা পাঠাইতেছেন। সারদাকান্ত ও বেণীমাধবের মারফতে সমস্ত জিনিস আসিবে, ঠাকুরের এইরূপ আদেশ ছিল। এইরূপ নানা বিভাগে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে নিয়োজিত করিয়া এই সুবৃহৎ ব্যাপারের কর্ম্ম-শৃঙ্খলা বিধান করা হইয়াছিল। যে কয়েকদিন ধরিয়া এই মহোৎসব চলিয়াছিল, তৎকালে পুরীধামে এমন দুঃখী কাঙ্গাল সাধু সন্ন্যাসী কেহই ছিলেন না, যিনি এইদানে বা সেবায় বঞ্চিত হইয়াছেন। এরূপ মহোৎসব ও মহাদান পুরীধামে কেহ কখনও দেখে নাই। ক্রমে ক্রমে কাপুড়িয়ার কাপড়, ঘটিওয়ালার ঘটি ও কম্বলওয়ালার কম্বল ফুরাইয়া গেল, তাহারা ধার করিয়া নূতন আমদানি করিতে লাগিল। এই কার্য্যটী এমনইভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল, যাহা দেখিলে ঘোর বিষয়ীর বিষয়-বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। এই মহাব্যাপারের মধ্যে জটীয়া বাবার সুবন্দোবস্ত, আচার আচরণ ও কার্য্যকলাপের মধ্য দিয়া তিনি যে

অসাধারণ শক্তি, নিগূঢ় ধর্ম্মভাব, দয়া ও ন্যায়পরতা এবং দেবচরিত্র ফুটাইয়া তুলিয়া জনসাধারণের চক্ষুগোচর করিয়াছিলেন বর্ত্তমান যুগে সেরূপ কোথাও দৃষ্টিগোচর কি শ্রুতিগোচর হয় নাই। সে সকলের বিস্তৃত বিবরণ এই প্রবন্ধে লিখিতে চেষ্টা করা ধৃষ্টতা মাত্র।

তিনি কি ভাবে দান করিয়াছিলেন একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। পুরীর সুপ্রসিদ্ধ মহান্ত জগন্নাথদাস বাবাজী সাধুদের জন্য একটী আশ্রম নির্ম্মাণ করিতেছিলেন। উহার ছাদের কার্য্য বাকি ছিল, তজ্জন্য তিনি জটীয়া বাবার নিকট সাতশত টাকা চাহিলেন। যখন হাজার হাজার টাকা অকাতরে বিতরণ করা হইতেছে, তখন একজন প্রসিদ্ধ মহান্তের প্রার্থনা যে পূর্ণ হইবে, সে বিষয় সন্দেহ করার কারণ ছিল না। কিন্তু জটীয়া বাবা করজোড়ে মহান্তকে বলিলেন, "আমি কিছুই নই, জগন্নাথদেবের হুকুন হইলেই দিতে পারি।" সে হুকুম হইল না। তিনি কাহারও মুখাপেক্ষা করিয়া কোনও কার্য্য করেন নাই।

সেই মহোৎসবের বিবরণ, প্রবাদের ন্যায় পুরীধামে আজিও লোকের কণ্ঠে কণ্ঠে বিঘোষিত হইতেছে। আর যাঁহারা এই ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহাদিগের হৃদয়ে সেই দৃশ্য জন্মের মতন অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে।

এই সকল ঘটনা দ্বারা বাহিরের কার্য্যকলাপের কথাই প্রকাশিত করা হইল; কিন্তু যে ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি এই সকল কার্য্য করিয়াছেন, পাতালস্থ ভোগবতী-গঙ্গার ন্যায়, হৃদয়-নিহিত সেই ভাব-স্রোত সাধারণের দর্শনীয় ও স্পর্শনীয় নহে, যাঁহারা সেই পবিত্র-স্রোতের কণিকামাত্রও স্পর্শ করিয়াছেন, তাঁহারা কৃতার্থ হইয়া গিয়াছেন। এই সৃষ্ট-জগৎ যেমন সৃষ্টিকর্ত্তার অসীম শক্তির সামান্য নিদর্শন মাত্র,

জটিয়া বাবার বাহিরের কার্য্যকলাপ ও সেইরূপ তাঁহার হৃদয়ের যৎকিঞ্চিৎ আভাসমাত্র প্রকাশ করিতেছে। অশ্রুজল এবং হাহাকারধ্বনি যেমন পুত্রশোকের কথঞ্চিত বাহ্য-বিকাশ মাত্র, তাঁহার কার্য্য-কলাপও তাঁহার হৃদয়ভাবের কথঞ্চিৎ বাহ্যবিকাশ ভিন্ন কিছুই নহে। কোন প্রকার প্রথা বা নিয়মের অনুরোধে তিনি কিছুই করেন নাই। তাঁহার অতলস্পর্শ হৃদয়ের যে ভাবটুকু বাহিরে উপচিয়া পড়িয়াছে, তাহাতেই প্রেমের বন্যার, দয়ার প্রবাহে দেশ ভাসিয়া গিয়াছে।

ঋণ-পরিশোধ।

এই মহোৎসবের পরে তিনি শিষ্যগণকে বলিলেন যে তাহাদের কিছুই ভাবিতে হইবে না, এক মাসের মধ্যে সমস্ত দোকান দেনা পরিশোধ হইয়া যাইবে এবং ঋণ-পরিশোধের পরের দিনই তিনি চলিয়া যাইবেন। তখনও শিষ্যগণ বুঝেন নাই, তিনি কিরূপ চলিয়া যাওয়ার আভাস দিতেছেন।

পাছে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঋণ-পরিশোধ না হইলে ঠাকুরের দুর্নাম হয়, এই ভাব মনে আসিয়া কোন কোন শিষ্যকে একটু চঞ্চল করিয়াছিল। এই জন্যই বোধ হয় ঠাকুর কয়েকজন বড়লোকের নাম করিয়া তাঁহাদের নিকট যাইতে বলিলেন। ইঁহাদের মধ্যে কোন ধনী ব্যক্তি এক সময় ঠাকুরকে আশ্রম-ব্যয়ের জন্য লক্ষ টাকা দিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। তিনি তাহা গ্রহণ না করিয়া বলিয়াছিলেন "আমি ফকির লোক, আমার যাহা প্রয়োজন তাহা ভগবানই দিতেছেন। আমার অন্য প্রয়োজন নাই।" আজ যে, তিনি কাহারও কাহারও নিকট জগন্নাথের ঋণ জানাইতে অনুমতি দিলেন, মনে হয়, ইহা শুধু শিষ্যবর্গকে শিক্ষাদানের জন্য। ঠাকুর যে অভাব জানাইতে বলিয়াছেন,

তাহা উক্ত ধনিগণ বিশ্বাসই করিলেন না। বিশ্বাস জন্মাইলে একজনই হয়ত সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া দিতেন।

এদিকে, শক্ত-বাঁধনটী খুলিয়া দিলে জড়ানো সূতাগুলি যেমন আপনি খুলিয়া যায়, গুরুদেবের দৃষ্টান্তে অনুগত শিষ্যগণের হাতের বন্ধনও খুলিয়া গেল। কৃপণ দাতা হইলেন, অলঙ্কার-প্রাণা অলঙ্কার পাঠাইলেন, কেহ বার্ষিক আয়ের সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া, কেহ বা বাড়ী বন্ধক রাখিয়া অর্থ পাঠাইয়া কৃতার্থ হইতে লাগিলেন। নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে সমস্ত দেনা পরিশোধ করা হইল। শিষ্যগণ বিস্ময়ের সহিত এই শিক্ষালাভ করিলেন যে, মনুষ্যের নিকট প্রার্থনা করিয়া কিছুই হয় না, ভগবান্ অযাচিতভাবে ভক্তের অভাব পূর্ণ করেন।

মহাপ্রস্থান।

ঋণ-পরিশোধের পরেই জটীয়া বাবাকে লইয়া কলিকাতা যাইবেন, শিষ্যগণের এই আশা ছিল। কিন্তু তিনি যে মহাপ্রস্থানের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, তাহা কেহ বুঝিতে পারে নাই। যে দিন সমস্ত ঋণ পরিশোধ করা হইল, তাহার পরের দিনই তিনি দেহরক্ষা করিলেন। সে দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করিতে ইচ্ছা হইতেছে না। তিনি সমস্ত জীবন নানা-ভাবে নানাদেশে রোগীর সেবা, দুঃখীর সাহায্য, সত্যের সম্মানরক্ষণ এবং জীবনে ও উপদেশে ধর্ম্মের মহিমা প্রতিষ্ঠিত করিয়া, সহস্র সহস্র নরনারীর শমনভয় বিদূরিত করিয়া, নামানন্দ-সুধাদানে তপ্তধরা জুড়াইয়া, মহা তেজস্বী ভাস্করের ন্যায় আপনার প্রভায় জগৎকে আলোকিত করিয়া নীলাচলে অস্তমিত হইলেন। তাঁহার স্থূলদেহ শিষ্যগণের চক্ষুর অগোচর হইয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার অপ্রতিহত প্রভাব ও অপার করুণা তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করে নাই।

উপসংহার।

নরেন্দ্র-সরোবরের দক্ষিণ-তীরে বসিয়া পণ্ডিত গদাধর, শ্রীমদ্ভাগবৎ পাঠ করিতেন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু সাঙ্গোপাঙ্গগণ সহ তাহা শ্রবণ করিতেন। সেইস্থানে দাঁড়াইয়া একদিন জটীয়া বাবা, সঙ্গীয় শিষ্য-গণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, নরেন্দ্রের উত্তর তীরে তাঁহারা কিছু দেখিতেছেন কিনা? তথন সেই উত্তর তীরটী জঙ্গল-পরিপূর্ণ পতিত স্থান ছিল, দুই চারি ঘর বাউরী জাতীয় লোক এবং দুই এক ঘর মুসলমান তথায় কুটীর করিয়া বাস করিতেছিল। শিষ্যগণ যাহা দেখিতে-ছিলেন তাহাই বলিলেন। তথন জটীয়া বাবা বলিলেন, "আমি দেখিতেছি মন্দির, সে মন্দিরের সোণার চূড়ো"। বহু শিষ্যের সম্মুখে একথা হইয়াছিল।

জটীয়া বাবার দেহরক্ষার পরে কয়েকজন সম্ভ্রান্ত লোকের চেষ্টায় অত্যল্প সময়ের মধ্যে নরেন্দ্র সরোবরের উত্তর তীরের সেই জঙ্গলময় জমি ১৪০০৲ টাকায় খরিদ করিয়া সেইখানে ঠাকুরের দেহ সমাধিস্থ করা হইল। আশ্চর্য্য এই যে, সেই মিউনিসিপালিটীর কর্ত্তা উকীল মহাশয়, যিনি সাধু ও বানর উভয়কেই সমান উৎপাত মনে করিয়া-ছিলেন, তাঁহারই বিশেষ চেষ্টায় এই জমি হস্তগত হইল। তিনি দায়গ্রস্তের ন্যায় এই কার্য্যে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলেন, তাঁহার ন্যায় একজন প্রভাবশালি-ব্যক্তি ঐকান্তিক যত্ন না করিলে কিছুতেই এই জমি হস্তগত হইত না। উক্ত উকীল মহাশয় নিজের গাভী দোহাইয়া সেই দুগ্ধ প্রথম দিনের সমাধি-সেবায় প্রদান করিলেন। ঠাকুরের কি বিচিত্র লীলা! যথন এই জমি গ্রহণ করা হয়, তথন

জটীয়া বাবার ভবিষ্যদ্বুক্তি, উক্ত জঙ্গলে মন্দির ও সোণার চূড়া দর্শনের কথা কাহারই মনে ছিল না।

নরেন্দ্র-সরোবর ও আঠারনালা এই দুই তীর্থের মধ্যস্থ সমস্ত জমি (প্রায় ১২ বিঘা) সমাধিক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এখন এই জমির মূল্য ২৫ হাজার টাকা হইতে পারে। সমাধির উপরে প্রস্তর-নির্ম্মিত মনোহর প্রকাণ্ড মন্দির উঠিয়াছে, মর্ম্মরপ্রস্তরে উহার ভিত্তি মণ্ডিত হইয়াছে, সাধকদিগের বাসের ও ভজনের জন্য দুইখণ্ডে ইষ্টকালয় এবং অনেকগুলি সাধন-কুটীর উঠিয়াছে, নানাবিধ বৃক্ষলতা ও ফলে ফুলে সুশোভিত হইয়া সমাধি-ক্ষেত্রটী প্রাচীনকালের তপোবনের শ্রীধারণ করিয়াছে; সেখানে বসিলে কাহারও উঠিতে ইচ্ছা হয় না। বোধ-হয় শীঘ্রই মন্দিরের মস্তক স্বর্ণচূড়ায় শোভিত হইবে। আশ্চর্য্য এই যে পুরীধামের বক্ষের উপর এত হাজার বৎসর পর্য্যন্ত এই সর্ব্বোৎ-কৃষ্ট স্থানটী খালি পড়িয়াছিল। এই আশ্রম ও মন্দির প্রস্তুত করিতে অন্যূন পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে। ইহার জন্য বাহিরের লোকের নিকট কিছুই চাওয়া হয় নাই। সমস্ত খরচই ভক্তগণ দিয়াছেন, অথচ ভক্তগণ অধিকাংশই দরিদ্র। শিষ্য-পত্নীগণ ও শিষ্যাগণ গাত্রালঙ্কার প্রদান করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিয়াছেন।

এই আশ্রম "জটীয়া বাবার সমাধি" বলিয়া বিখ্যাত। প্রতি বৎসর তিরোধান তিথিতে (চন্দন যাত্রার পরের দিনে) এখানে বাৎসরিক উৎসব হয়। তখন নানা স্থান হইতে বহু ভক্তের সমাগম হইয়া থাকে। জটীয়া বাবা দেহে থাকিতে বানরগণকে ও অন্যান্য জীব ও কাঙ্গালী-গণকে খাদ্য বিতরণ করিতেন, সেবাইত মহাশয় সে সকল যথাশক্তি বজায় রাখিয়াছেন। মুঙ্গের জামালপুর স্কুলের ভূতপূর্ব্ব এডিশনাল

হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত সারদাকান্ত বন্দোপাধ্যায় বি,এ, মহাশয় চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া বহুকাল হইতে গুরুর সেবা করিতেছিলেন, বর্ত্তমানে তিনিই আশ্রমের সেবাইত আছেন।

এই আশ্রমে উপস্থিত হইলে স্থান-মাহাত্ম্যে অপূর্ব্ব শান্তিরসে প্রাণ অভিভূত হয়, বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী শত শত নরনারী এখানে উপস্থিত হইয়া তাপিত প্রাণ জুড়াইয়া থাকেন।

মেলা-ভঙ্গ।

মেলা ভাঙ্গিল। সেই শেষ দিনে সাধুরা পরস্পরকে ছাড়িয়া চলিলেন। যেন কতযুগের বান্ধবের নিকট পরস্পর বিদায় গ্রহণ করিলেন। কোন প্রকারের ঘটনা যাঁহাদিগকে বিচলিত করিতে পারেনা, কোনও প্রকারের আশক্তিতে যাঁহারা আবদ্ধ নহেন, তাঁহাদের চক্ষে জল আসিল। গোস্বামী মহাশয়ের নেত্রযুগলে ধারা বহিল। বড় কাঠিয়া বাবার মুখমণ্ডল বর্ষণোন্মুখ মেঘমণ্ডলের আকৃতি ধারণ করিল, সকলেরই প্রাণ ব্যথিত হইল। অর্জ্জুনদাস হটাৎ কোথায় অন্তর্হিত হইলেন কেহই তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইল না।

কিসের সহিত তুলনা করিব? কি স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, কেমনে তাহার বর্ণনা করিব? এই একমাস কাল গঙ্গার চড়ায় যাহা মিলিয়াছিল তাহাকে কি বলিব? মহামেলা বলিব? মহোৎসব বলিব? স্বর্গরাজ্য বলিব? কিছু বলিয়াইত প্রাণ পরিতৃপ্ত হয় না। চাঁদের হাট ভাঙ্গিয়া গিয়াছে! পুষ্পাভরণে ভূষিত শেফালিকা তরু শরতের নৈশ ঝটিকায় কুসুম শূন্য হইয়া প্রভাতে যেরূপ শ্রীহীন ও সৌরভহীন হয়, মেলাবসানে

ত্রিবেণীক্ষেত্রও সেইরূপ শ্রীশূন্য ও সৌভাগ্যহীন হইয়াছে! সেই গঙ্গা-যমুনার মিলনস্থল প্রকাণ্ড চড়াভূমি মৃতবৎসা বিধবার পতি-পুত্রহীন বক্ষ-স্থলের ন্যায় সর্ব্বপ্রকার সৌভাগ্যও সম্পদশূন্য হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। এক প্রকাণ্ড মহানগর এক দিনের মধ্যে মহাপ্রান্তরে পরিণত হইল! দ্বাদশ বৎসর প্রয়াগভূমি সতৃষ্ণ নয়নে আবার সেই শুভদিনের প্রত্যাশায় চাহিয়া রহিল।

শিক্ষা।

১। "মতের বিশুদ্ধতা দ্বারা কেহ পরিত্রাণ লাভ করে না, কিন্তু পবিত্র-জীবন লাভই পরিত্রাণের উপায়,"—এক দিন কোন শ্রদ্ধেয় ধর্ম্ম-প্রচারকের মুখে এই উদার এবং সত্যবাক্য শুনিয়াছিলাম। কুম্ভ-মেলায় এই তত্ত্বটী মূর্ত্তিমান্ প্রকাশিত দেখিলাম। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্মমত ও আচার আচরণ লইয়া বহুপ্রভেদ। এমন কি, এক সম্প্রদায়ের ধর্ম্মার্থব্যবহার্য্য বস্তু অন্য সম্প্রদায়ের অস্পৃশ্য। কেহ দ্বৈতবাদী, কেহ অদ্বৈতবাদী, কেহ বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদী, কেহ সাকার-উপাসক, কেহবা নির্গুণ ব্রহ্মবাদী। কিন্তু ইহাদের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রকৃত ধার্ম্মিকতা রহিয়াছে। ধর্ম্ম যাহা, তাহা সকলের মধ্যেই এক, পার্থক্য কেবল বাহিরের আচরণে। মানুষের শারীরিক গঠন বিভিন্ন হইলেও যেমন মনুষ্যত্বের একটা সার্ব্বভৌমিক মিলন আছে, প্রাণ-রাজ্যের ও হৃদয় রাজ্যের একটা একতা আছে, বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যেও সেইরূপ প্রকৃত ধর্ম্মের মিলন আছে। গোমুখীতে গঙ্গা অতিশয় অপ্রশস্ত একটী খরস্রোতমাত্র, উভয়পার্শ্বের শিলাখণ্ড সকল সরাইয়া নির্জ্জনপথে অভ্রভেদী

পর্ব্বতশৃঙ্গের মধ্য দিয়া প্রকাণ্ড অজগরের ন্যায় অবিরাম তীব্রগতিতে নিম্নদিকে ছুটিয়াছে। সেই গঙ্গা, প্রয়াগের সমতলভূমিতে আসিয়া, উভয়পার্শ্বস্থ ক্ষেত্ররাজিকে শ্যামলশস্যে পরিশোভিত করিয়া, সুপ্রশস্ত প্রবাহিণী রূপে আপনার সৌন্দর্য্য-প্রভায় আপনি মুগ্ধ হইয়া দক্ষিণ-বাহিনী হইয়াছে। গোমুখীর চঞ্চলা বালিকা, প্রয়াগে যৌবন-শ্রী ধারণ করিয়া আপনার আবেগ আপনাতে সম্বরণ পূর্ব্বক মৃদুমন্দ-ভাবে চলিয়াছে। কলিকাতায় আবার ভিন্নশ্রী; এখানে অতুল ঐশর্য্যের মুকুট মাথায় পরিয়া, ঘোরতর সংসার-কোলাহলের মধ্য দিয়া রাজরাজেশ্বরীরূপে সাগর-সঙ্গমে ছুটিয়াছে। গোমুখী হইতে সাগর-সঙ্গম পর্য্যন্ত একই স্রোত, কিন্তু বাহ্যলক্ষণ কিরূপ বিসদৃশ! কোথাও অত্যুন্নত পর্ব্বতশ্রেণী, কোথাও শ্বাপদাকীর্ণ ভীষণ অরণ্যের মধ্য দিয়া এই স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে। কোথাও ঋজু, কোথাও কুটিল, কোথাও সংকীর্ণ, কোথাও প্রশস্তভাবে বিভিন্ন অভিমুখে ইহার গতি হইয়াছে। কোন এক ব্যক্তিকে গোমুখীতে গঙ্গা দেখাইয়া যদি প্রয়াগে আনিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়, আবার সেখান হইতে কলিকাতায় লইয়া আসা যায়, সে কখনও বুঝিতে পারিবে না যে, এই সকল স্থানেই সেই একই নদী। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি গোমুখীর স্রোতে অবগাহন করিয়া বরাবর সেই স্রোতেই ভাসিয়া ডুবিয়া আইসে, তবে বাহ্যিক সহস্র পরিবর্ত্তনের মধ্যেও তাহার কখনও সন্দেহ হইবে না যে, এই সমস্ত একই স্রোত কি না? সেই প্রকার, মানুষ যতদিন ধর্ম্মরাজ্যে ডাঙ্গে (খুঁজিতে) হাঁটে, বাহিরের কতকগুলি পার্থক্য, কতকগুলি মতামতের কাটাকাটি দেখিয়া সে মনে করে, এই সকল ধর্ম্মই ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু যখন অন্তর-নিহিত একটী নিগূঢ় স্রোতে আপনাকে ছাড়িয়া দিতে পারে, তখন সমস্ত বৈচিত্রের মধ্যে এক আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য দেখিতে পায়, সমস্ত বিবাদের একই মিলনে পরিণতি

হয়। তখন মত লইয়া মনান্তর হয় না, এবং প্রেম তখন, অলক্ষ্য-সাংসারিকতা-মিশ্রিত স্বদলবদ্ধ সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে থাকে না। হৃদয় এমন একটী উদার ভূমি প্রাপ্ত হয় যে, সকল সম্প্রদায়, সকল দলকেই সেখানে সযত্নে বসাইতে পারে। আমার মত যে বিশ্বাস করে না সে সুবোধ নহে, এবং আমার আচরণের ন্যায় যে আচরণ করে না সে ধার্ম্মিক নহে, এইরূপ দূষিত-জ্ঞান তখন বিদূরিত হয়। কুম্ভমেলা সন্দর্শন করিলে এই মহৎ ভাবগুলির সাকার মূর্ত্তি প্রাণে প্রকাশ পায়।

২। এক সময় দেশের কোন একজন প্রধান ব্যক্তি * আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "যাঁহারা নির্জ্জনে থাকিয়া গভীর ধ্যান করেন, তাঁহাদের দ্বারা জগতের কি কল্যাণ সাধিত হয়?" আমি তাঁহাকে বলিলাম, "বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া যতদূর মানসম্ভ্রম ও উচ্চপদের প্রত্যাশা করা যায়, তাহা আপনার লাভ হইয়াছে; অর্থসামর্থ্য, সামাজিক মর্য্যাদা, পারিবারিক সুখ, আপনার যথেষ্ট আছে; আপনাকে আমি জিজ্ঞাসা করি, এ সমস্ত লইয়া আপনি শান্তিলাভ করিয়াছেন কি?" তিনি অতি মহাশয় ব্যক্তি, সরল ভাবে বলিলেন—"না, আমি শান্তিলাভ করি নাই।" আমি বলিলাম, "আপনার ন্যায় সর্ব্বস্ব পাইয়াও যাঁহাদের শান্তি নাই, ঐ সকল ধ্যানস্থ ব্যক্তিরা তাঁহাদিগকে শান্তি-পথ দেখাইয়া দেন।" বস্তুতঃ, মানুষ যতদিন কোন নিত্যভূমিতে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারে ততদিন সদসৎ কোন কার্য্যেই তাহাকে স্থির-শান্তি দান করিতে পারে না। শয্যাগত রোগীর মুখে একটু মিষ্টান্ন দিলে যেমন তাহার সাময়িক কিছু সুখ হয়, কিন্তু স্থায়ী যন্ত্রণার নিবারণ হয় না, পৃথিবীর বস্তু ধরিয়া জীবের সুখও সেইরূপ। এইজন্য গভীর ধ্যানের দ্বারা আগে ভগবান্‌কে জানিতে হয়; তাহার পর যে কার্য্য করিবে,

* স্যার ৺রমেশচন্দ্র মিত্র।

তাহাতেই পূর্ণশান্তি। তবে ব্রহ্মলাভের পূর্ব্বে কোন কার্য্য করিবে না এরূপ নহে; কিন্তু সে কার্য্য তপস্যামাত্র, তাহা সেবানন্দ নহে। সেবক না হইয়া সেবা করা যায় না; কর্ত্তাকে না পাইলে, তাঁহার হুকুম না শুনিলে, সেবক হওয়া যায় না। দুষ্কার্য্য হইতে বিরত না হইলে, শান্ত ও সমাহিত না হইলে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে হৃদয়-গ্রন্থি ভেদ হয় অর্থাৎ মোহপাশ বিনষ্ট হয়, সকল সংশয় ছিন্ন হইয়া যায়। এই সকল অগ্রপশ্চাৎ লক্ষণের সহিত মিলাইয়া স্থির করিতে হয়, আমি কোন্ শ্রেণীর জীব? নতুবা ভ্রম হয়। স্বেচ্ছাচারিত, অনুকরণোত্তেজিত বা গতানুগত ভাবে কর্ম্ম করিয়া তাহাতে যে একপ্রকার আনন্দ হয়, তাহাকেই সেবানন্দ বলিয়া ভ্রম জন্মে। বস্তুতঃ আগে কর্ত্তা, পরে সেবক, তাহারই পরে সেবা হয়। সেবক না হইয়া কর্ম্ম করিলেই সে কর্ম্মে "আমিত্ব" থাকে। এই তত্ত্বটী যাঁহারা বুঝেন না, তাঁহারাই ধ্যানধারণা অপেক্ষা সৎকার্য্যকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন এবং সাধুসন্ন্যাসী-দিগকে জগতের ভারস্বরূপ বোধ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ কিঞ্চিৎ উদার; তাঁহারা বলেন, ধ্যান করাও মন্দ নয়, কর্ম্ম করাও মন্দ নয়, সকলই ধর্ম্ম। হিন্দু সাধুরা কিন্তু বলেন, গভীর ধ্যান ভিন্ন ধর্ম্মকে ধরারই উপায় নাই। সমস্ত সৎকার্য্য ও রীতি নীতি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ন্যায়, কিন্তু ধ্যানই ধর্ম্মের প্রাণ। ধ্যান ভিন্ন ধর্ম্মসাধন, প্রাণহীন দেহে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস সঞ্চালনের ন্যায় বাহ্যদৃশ্যে সজীবতা রক্ষা মাত্র, যেমন "মৃতের নয়নে অঞ্জন পরা"। এই জন্যই এ দেশের সাধুরা সমস্ত কার্য্যাপেক্ষা ধ্যানের জন্য লালায়িত, ধ্যানের জন্যই ইহাঁদের উদাসীনতা ও কৃচ্ছ্রসাধন। ইহাঁদের দৃষ্টান্তে জগতের কল্যাণ, ইহাঁদের জীবন ধারণই ধর্ম্মপ্রচার।

৩। কেহ কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "কুম্ভ-মেলায় যে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়া গেল, তাহাতে দেশের কি কল্যাণ সাধিত

হইল? এই অসংখ্য টাকা দ্বারা কতকগুলি স্থায়ী-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হইলে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইত।" আমি অর্থ-ব্যবহার শাস্ত্র বুঝি না; কিন্তু কল্যাণ শব্দটার একটা মোটামুটী অর্থ বুঝি। যাহাতে মানবাত্মার কল্যাণ হয় অর্থাৎ হৃদয়-গ্রন্থি ভেদ হয়, তাহাকেই আমি কল্যাণ বলি। সে কল্যাণ, অর্থের সদ্ব্যবহার দ্বারাও হইতে পারে, আর মূদ্রা-মুষ্টিকে ধূলিমুষ্টির ন্যায় ধরিয়া জলে ফেলিয়া দিলেও হইতে পারে। একজন সাধুর নিকট (মহাত্মা দয়ালদাস) কোন ধনী এক বস্তা টাকা লইয়া করযোড়ে বলিলেন—"বাবা, আমার টাকাটা তোমার আশ্রমে সাধু-সেবায় লাগাইয়া দাও।" সাধু বলিলেন,—"কি করিব বাবা, এখানে আর আজ হইবে না; পূর্ব্বে যাহারা টাকা দিয়াছে, তাহাদের থাকিতে তোমার টাকা কিরূপে খরচ করিব? তুমি অন্যত্র যাও।" এই দৃশ্যটী দেখিয়া আমার প্রাণের যে কলাণ হইল, সাধু যদি ঐ টাকা লইয়া কোন বিশেষ সদ্ব্যয়ও করিতেন, তাহা দেখিয়া সেইরূপ কল্যাণ হইত কি না, বলিতে পারি না। আর এক কথা এই যে, অর্থকে এইরূপ জলের মতন না দেখিলে, শিলাবৃষ্টির ন্যায় টাকাও আসিত না।

৪। অনেকের সংস্কার আছে যে, যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সাকারবাদ কি অবতার-বাদ প্রভৃতি মানিতে পারেন না। এখানে দেখিলাম, যাঁহারা বিচারে ও সাধনে ব্রহ্মজ্ঞানী, তাঁহারাও অবতার-বাদ মানেন এবং সাকারবাদকেও অগ্রাহ্য করেন না। যদি কেহ বলেন, তাঁহা-দের ব্রহ্মজ্ঞান হয় নাই, তবে তাঁহারা হয় ত মনে করেন যে সাকারবাদ ও অবতার না মানাই ব্রহ্মজ্ঞানের একটী বিশেষ লক্ষণ; কিন্তু এরূপ হাত-গড়া লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া জীবন্ত সাক্ষ্যকে উপেক্ষা করা যায় না।

৫। "না করিবে অন্য দেবের নিন্দন বন্দন"—চৈতন্য ধর্ম্মের এই মহামন্ত্র সাধুদিগের জীবনে মুর্ত্তিমান্ দেখিলাম। সাধুরা পরনিন্দাকে

চুরি কি ব্যভিচার অপেক্ষা কোন অংশে কম নিন্দনীয় মনে করেন না। পরনিন্দা ও আত্ম-প্রশংসা এই উভয়কেই অসত্য মধ্যে গণনা করেন। মিষ্টান্নের দোকানে নানাবিধ খাদ্য সজ্জিত থাকিলেও, তুমি যেটী বড়ই ভাল বাস, অন্যান্য সকল বস্তুকে অতিক্রম করিয়া তোমার চক্ষু বিশেষ-ভাবে সেইটীতেই সংলগ্ন হইবে। সাধুদের মনের টান গুণের দিকে সুতরাং তাঁহারা যাহাকে দেখেন, তাহারই গুণটুকু আগে দেখেন এবং তাহাতেই আসক্ত হন; কাজেই পরনিন্দা ইহাঁদের ঘটিয়া উঠে না। আমাদের কোন বন্ধু মহাত্মা অর্জ্জুনদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন "খৃষ্টানেরা কেমন লোক? তাহারা ত সকল জাতির সঙ্গে একত্র আহার করে, জাতি মান্য করে না।" তিনি বলিলেন, "আহা, ও ত ফকীরি ভাব, অতি চমৎকার।" খ্রীষ্টের কথায় সাধুরা বলেন "তিনি ত বিদেহ-মুক্ত মহাপুরুষ।" শেখা ধর্ম্ম আর ফোটা ধর্ম্ম দুইটী স্বতন্ত্র বস্তু। কাহারও নিন্দা করা উচিত নয়, এই শিক্ষা পাইলাম; মনের মধ্যে চাপিয়া রাখিয়া নিন্দা বাক্যে প্রকাশ করিলাম না, ইহা শেখা ধর্ম্ম। ভগবানের নামে রুচি হওয়ায় দোষ-দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়াছে, যেদিকে তাকান কেবল গুণেরই দর্শন হয়, নিন্দার বিষয় অপেক্ষা প্রশংসার বিষয়ই প্রাণে জাগিয়া উঠে, ইহারই নাম ফোটাধর্ম্ম। যাঁহাদের ধর্ম্ম ফুটিয়াছে, তাঁহারাই শান্ত হইয়াছেন। তাঁহারা কাহাকেও উদ্বিগ্ন করেন না এবং কাহারও দ্বারা উদ্বিগ্নও হন না। যাহারা পরনিন্দা, পরচর্চ্চা করে, সাধুদের মতে তাহারা ধর্ম্মের প্রথম স্তরেও পদক্ষেপ করে নাই।

কুম্ভ-মেলায় অনেক শিক্ষার বিষয় আছে। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে তাহা বিস্তারিত ভাবে প্রকাশ করা অসম্ভব। অতি সংক্ষেপে কিঞ্চিন্মাত্র উল্লিখিত হইল।

সাধু-সঙ্গ।

সাধুরা নিরাকারের সাকারমূর্ত্তি। প্রেম, ভক্তি, পবিত্রতা, সরলতা, এ সকল নিরাকার বস্তু। সৌন্দর্য্য যেমন পদার্থের মধ্য দিয়া বিকশিত না হইলে মানুষ উহাকে জানিতে পারে না, ঐ সকলও সেইরূপ ব্যক্তির অন্তরে না ফুটিলে কিছুতেই স্বরূপ প্রকাশিত করে না। ভক্তকে মানি না, ভক্তি মানিব, সাধুকে মানি না সাধুতা মানিব, এ সকল উক্তি কথার কথা মাত্র। সুন্দরকে চাহি না, কিন্তু সৌন্দর্য্যকে ভালবাসি একথা একটা প্রহেলিকা। কাহারও ভক্তি ফুটিয়াছে কি না ইহা যদি জানিতে হয়, তবে দেখিব ভক্তের প্রতি তাহার কিরূপ ভাব। ভক্ত-সঙ্গ মুক্তিলাভের প্রধান উপায় এবং ভক্ত-সঙ্গ ভক্তি-বিলাসের প্রধান ক্ষেত্র। ভক্তকে যে ভক্তি করে, ভগবান্ তাঁহার ভক্তি গ্রহণ করেন ;—

"যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তা মম ভক্তাশ্চ তে নরাঃ॥"

ভগবান বলিলেন, "হে অর্জ্জুন, যাহারা আমার ভক্ত, তাহারা আমার (প্রকৃত) ভক্ত নহে, কিন্তু আমার ভক্তের যাহারা ভক্ত, তাহারাই আমার (প্রকৃত) ভক্ত।"

"মদ্ভক্তবল্লভো যস্য স এব মম বল্লভঃ।
তৎপরো বল্লভো নাস্তি সত্যং সত্যং ধনঞ্জয়॥

আমার ভক্ত যাহার বল্লভ, সেই আমার বল্লভ। হে ধনঞ্জয়, সত্য সত্য তাহার অধিক আর বল্লভ নাই।

সাধুসঙ্গের অপার মহিমা, ভক্ত-জীবনের অপার মহিমা, শাস্ত্রকারেরাই বুঝিয়াছিলেন। দোষ-দৃষ্টি-যুক্ত আমরা কেবল তর্কজাল বিস্তার করিয়া সাধুদিগকে হৃদয় হইতে দূরে রাখিতে চাই। যোগিবর ঈশা বলিয়াছেন, "যে পুত্রকে দেখিয়াছে, সেই পিতাকে দেখিয়াছে।" জ্ঞানাবতার শঙ্কর বলিয়াছেন, "ক্ষণমিহ সজ্জন-সঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা।" সাধু-সঙ্গরূপ ভব-নদীপারের তরনী ঘাটে ঘাটে বাঁধা রহিয়াছে, অথচ অহঙ্কারে অন্ধনেত্র হইয়া আমরা স্বেচ্ছাচারে ঘুরিয়া মরিতেছি।

সাধুদিগের প্রেম এক অদ্ভুত বস্তু। সে প্রেম, সংসার লালসাকে উদ্রিক্ত করে না, কিন্তু পরিশ্রান্ত মানবাত্মাকে বিশ্রাম প্রদান করে। সাধুদিগের পরস্পরের প্রেম কি অপার্থিব! যাঁহারা সংসারের কোনও ধারই ধারেন না, কিছুতেই আসক্ত নহেন, তাঁহারাও সাধুপ্রেমে মুগ্ধ! কুম্ভমেলার অবসানে, সেই শেষ বিদায়ের দিনে, যখন সাধুরা পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন, তখনকার ভাব কি চমৎকার! কাহারও গণ্ডস্থল বহিয়া প্রেমাশ্রু পতিত হইতেছে, কাহারও মুখমণ্ডল অপার্থিব অনুরাগ-ভরে রক্তিম আভা ধারণ করিয়াছে। সতৃষ্ণ লোলুপ-দৃষ্টিতে পরস্পরকে হৃদয় ভরিয়া দেখিয়া লইয়া সাধুরা বিদায় গ্রহণ করিলেন, সকলের হৃদয়ে সকলে চিরকালের জন্য চিত্রিত হইয়া রহিলেন।

কুম্ভমেলা ফুরাইল, চাঁদের হাট ভাঙ্গিয়া গেল, কৃষ্ণশূন্য বৃন্দারণ্যের ন্যায় শূন্যভূমি নীরব পড়িয়া রহিল। যে দৃশ্য দেখিয়াছি, জাগ্রতে স্বপ্নে তাহার ছায়া প্রাণের কাছে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; শুষ্কতার সময় এখনও তাহা ভাবিলে প্রাণ সরস হয়, পাপে তাপে এখনও সে দৃশ্য হৃদয়কে সতেজ রাখে। মেলা ত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, সাধুরা দেশদেশান্তরে চলিয়া গিয়াছেন, আমরা ত বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছি; কিন্তু এখনও মনে ইচ্ছা হয়, সেই পুণ্যসলিলা গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমে, সেই

ত্রিবেণীক্ষেত্রের প্রকাণ্ড চড়াভূমিতে, সেই ভক্ত-পদরজ-পূত প্রশস্ত পুণ্যক্ষেত্রে, একবার হরি হরি বলিয়া গড়াগড়ি দিয়া তাপিত প্রাণ শীতল করি।

সাধুরা আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন,
ভক্তেরা আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন,
জগন্মঙ্গল হরিনাম আমাদের জীবনে
জয়যুক্ত হউক।

ওঁ শান্তিঃ।



প্রয়াগধামে কুম্ভ-মেলা।

প্রথম সংস্করণের উপর অভিমত।

জ্ঞানবৃদ্ধ স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের অভিমত।

"কুম্ভমেলা, অতি সুন্দর ও মনোহর পুস্তক হইয়াছে। প্রাতঃস্মরণীয় সাধু মহাত্মাদিগের নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ চরিত্রের যে জীবন্ত চিত্র আপনি অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা হৃদয় উন্মাদকারী ও প্রাণস্পর্শী হইয়াছে। এই ত্রিতাপ-জ্বালা-পূর্ণ সংসারে আপনার এই পুস্তকখানি অতীব শান্তিপ্রদ হইয়াছে।"

দেশপূজ্য স্যার শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিমত।

"আপনার "প্রয়াগধামে কুম্ভমেলা" নামক পুস্তকখানি পাঠ করিয়া অতিশয় আনন্দলাভ করিলাম। কুম্ভমেলার পবিত্র দৃশ্য আপনার পবিত্র হৃদয়ে যেরূপ অঙ্কিত হইয়াছে, আপনার সরল ও ভাবপূর্ণ ভাষায় আপনি তাহার একটী অতি সুন্দর প্রতিলিপি এই পুস্তকে চিত্রিত করিয়াছেন। তদ্দারা মেলাদর্শন যাঁহাদের অদৃষ্টে ঘটে নাই, তাঁহাদের অনেকটা ক্ষোভ নিবারণ হইবে। আমি তাঁহাদের মধ্যে একজন, এই পুস্তকখানি প্রণয়ন করাতে আমি মনের সহিত আপনার ধন্যবাদ করিতেছি।"

সাহিত্যরথী ৺ চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের অভিমত।

——"এই পুস্তিকায় তাঁহাদের (সাধুদিগের) অপূর্ব্ব লোকানুরাগ, মায়া, প্রীতি, দয়া ও দানশীলতার কথা পড়িয়া যেমন মুগ্ধ ও চমৎকৃত, তেমনই আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। * * * *

তত্ত্বজ্ঞান মূলক না হইলে কর্ম্ম যে বিশুদ্ধ ও নিষ্কাম হয় না, মনোরঞ্জন বাবু তাহা বুঝাইয়াছেন। তিনি আমাদের ধর্ম্ম সাহিত্যের বড় উপকার করিয়াছেন।"

প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয়ের অভিমত।

"আপনার "কুম্ভমেলা" আকারে ক্ষুদ্র হইলেও গুণে বৃহৎ; ইহার প্রতি পংক্তিতে ভক্তিসুধা উথলিয়া পড়িতেছে। * * * * ক্ষুদ্র রজনীগন্ধা, ক্ষুদ্র জুঁই, যে ভাবে লোকগণকে আমোদিত করিতে সক্ষম, এ পুস্তক ও সেইরূপ শক্তি ধারণ করে এবং ক্ষুদ্র কুসুম গুলির ন্যায় ইহাও সঙ্কেতে স্বর্গের কথা জ্ঞাপন করে।"

মনোরঞ্জন বাবুর অন্যান্য পুস্তক।

মনোরমার জীবন-চিত্র।

মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা।

সুবিখ্যাত জননায়ক "ভক্তিযোগ" প্রণেতা স্বনামধন্য

শ্রীযুক্ত অশ্বিনী কুমার দত্ত মহাশয়

(১৯ শে আশ্বিন, ১৩২১, নাসিক হইতে) লিখিয়াছেন :—

"তোমার পুস্তকখানি একটী অমৃতভাণ্ড। বড়ই আনন্দিত হইয়াছি, তোমার নিজের কথা যাহা লিখিয়াছ তাহাতেও বড় সুখ পাইয়াছি। আমারও তোমাকে তোমার বিশিষ্ট বৈষ্ণবের কথা বলিতে ইচ্ছা হয়। আমারি মতো যাঁহারা তোমার আত্মীয়, তাঁহারা উহাতে আনন্দ পাইবেন,

তবে বাহিরের লোকের কথা কি হইবে বলিতে পারি না, কিন্তু অত হিসাব ভাল কি ? তুমি বরিশালের একখানি অপূর্ব্ব ছবি আঁকিয়াছ, বড় জবর লেখনেওয়ালা ! যাহা লিখিয়াছ তাহা যেন প্রাণের মধ্যে ঝক্মক্ করিতেছে। "দেবী" সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছ তাহার ত কথাই নাই; আর দাতা কালীকুমারের কন্যা অমন হইবেনই না বা কেন ? মজুমদার-পরিবারের কি চমৎকার বিবরণই দিয়াছ ! একেবারে নিখুঁত, ঠিক্ যেমনটী তেমন। বাহবা চিত্রকর ! আর সেই "সদানন্দ ঢোল," সেই আমাদের কালীচরণ, ইহাদের ফটোই বা কি সুন্দর উঠিয়াছে, একেবারে হুবহু। এদিকে তোমাদের জীবনের ঘটনার বৈচিত্র ত বইখানিকে একখানি মনোরঞ্জন উপন্যাস করিয়া রাখিয়াছে, সর্ব্বোপরি ঠাকুরের দিব্যজ্যোতিঃ ইহাকে কিরূপ ভাস্বর করিয়াছে ! কি আর লিখিব, নিকটে পাইলে একটা নিবিড় আলিঙ্গনে কিঞ্চিৎ মনের ইচ্ছা পুরাইতাম। দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য উদ্‌গ্রীব রহিলাম।"

(২)

ভূতপূর্ব্ব স্কুল সমূহের ইনস্পেক্‌টার ও কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ, পণ্ডিতাগ্রগণ্য—

শ্রীযুক্ত শশীভূষণ দত্ত মহাশয় কলিকাতা, সুকিয়া ষ্ট্রীট, হইতে ১৪।১০।১৪ তারিখে লিখিয়াছেন ঃ—

"আমার বলিবার আবশ্যক নাই যে পুস্তকে মধুময় কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডের নিমিত্ত সকল পাঠকই অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করিয়া আছেন, আমিও থাকিলাম।"

(৩)

৺কাশীধামের রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম হইতে (১।২।১৫ তারিখে) পণ্ডিতবর **স্বামী তুরিয়ানন্দ** লিখিয়াছেন :—

"মনোরমার জীবনচিত্র পাঠ করিয়া আমি যে কি আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম তাহা আর লিখিয়া কি জানাইব? এতাদৃশী জীবনকাহিনী লিখিয়া সঙ্কুচিত হইবার কিছুই নাই। বরং আমার মনে হয় যদি আপনি ইহা না লিখিতেন তাহা হইলে সাধারণের উপর আপনার অত্যাচার করা হইত, কারণ লোকতঃ তিনি আপনার সহধর্ম্মিণী হইলেও ধর্ম্মতঃ আমাদের সকলেরই মহাহিতসাধিনী ও মনোরঞ্জন-কারিণী। তাঁহার পূতচরিত্র লিখিতে যাইয়া আপনি আরও কতকগুলি আদর্শ-চরিত্রের বর্ণনা করিয়া আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছেন। কতদিনে আপনার প্রতিশ্রুত ইহার দ্বিতীয় খণ্ডের দর্শন পাইব সেই আশায় আমরা উদ্গ্রীব হইয়া রহিলাম। অচিরে আমাদের সেই আশা পূর্ণ করেন আমার ইহাই আপনার নিকট সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ। প্রভু আপনার শরীর স্বচ্ছন্দ রাখুন ও এই মহতী চেষ্টার প্রেরণা ও শক্তি আপনাকে দান করিয়া, অভিলষিত ব্রত সম্পাদনে সক্ষম করুন সর্ব্বান্তকরণে তাঁহার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি।"

(৪)

শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী

জমিদার সু-কবি (বরিশাল হইতে) ১৩২১।২৬ শ্রাবণ তারিখে লিখিয়াছেন :—

"আদ্যন্ত একেবারেই পড়িয়া ফেলিয়াছি, পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া থাকা যায় না, লেখার এমনই একটি মোহন আকর্ষণ।

দ্বিতীয় খণ্ডের অপেক্ষায় কতদিন আশান্বিত হইয়া থাকিতে হইবে জানাইবেন। এই বই প্রতি ঘরে একখান করিয়া থাকা দরকার। অনেকস্থলে চোখের জলে অক্ষর দেখিতে পাই নাই, এতই আত্মহারা হইয়া গিয়াছিলাম।”

(৫)

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ

কোন কোন অবান্তর বিষয়ের প্রচার প্রণালী সম্বন্ধে মতান্তর প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন, “তথাপি এই পুস্তক পাঠ করিয়া আমি উপকার ও শান্তিলাভ করিয়াছি।”

(৬)

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন :—

—“মনোরমার জীবনচিত্র সেই রমনীরত্নের নিজের গুণে এবং চিত্রকরের চিত্রাঙ্কণের গুণে এতই সদ্‌গুণপূর্ণ যে, তাহাতে দোষ থাকিলেও

এক দোষ গুণরাশি মাঝে ডুবে যায়,
শশাঙ্কে কলঙ্ক যথা কৌমুদী মাঝারে। ইত্যাদি।”

(৭)

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত এম, এ, বেদান্তরত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন :—

—“এই গ্রন্থ পাঠে পাঠকের যথেষ্ঠ উপকার হইবে। অতএব ইহার প্রকাশ করিতে আপনার সঙ্কোচ বোধ হওয়ার কোন কারণ ছিলনা। এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ হওয়া উচিত।”

নব্যভারত—“এ পুস্তকখানি অতি উপাদেয় গ্রন্থ। ‘মনোরমার জীবন-চিত্র’ পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া উঠা যায় না। ভাষার প্রাঞ্জলতা, ভাবের গাম্ভীর্য্য এবং মার্জিত রুচির সমাবেশে এই গ্রন্থ উপন্যাস অপেক্ষাও প্রীতিকর ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। “মনোরমা” যেন এক স্বর্গের দেবী, তিনি যখন মর্ত্ত্যলোকে ছিলেন, তখন যিনি তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন, তিনিই কৃতার্থ হইয়াছিলেন। তিনি অসময়ে স্বর্গারোহণ করিলে অনেকেই ভাবিতেন, এই অমূল্য জীবন কি বৃথা যাইবে? ভাবিতেন, কবে তাঁহার অমূল্য জীবন-কথা ঘরে ঘরে প্রচারিত হইবে? মনোরঞ্জন বাবু ধন্য যে সাধ্বীর অমূল্য জীবন-কথা প্রচার করিতে অবসর পাইয়াছেন। * * * ধর্ম্মের শক্তি যাঁহারা অস্বীকার করেন, মনোরমার জীবন-চিত্র তাঁহাদিগকে পাঠ করিতে অনুরোধ করি ; সন্দেহ জালে যাঁহারা দোদুল্যমান, এই বিশ্বাসী দেবকন্যার “জীবনী” পাঠ করিতে তাঁহাদিগকেও একান্ত মনে অনুরোধ করি। মনোরমার জীবনী অক্ষয় বিশ্বাস-মন্ত্রে লিখিত, ভক্তিতত্ত্বের ইহা অপূর্ব্ব ইতিহাস। বঙ্গের বর্ত্তমান অবিশ্বাসের দিনে ঘরে ঘরে এই পুস্তক প্রচারিত হউক।”

নির্ব্বাসন-কাহিনী।

মূল্য ॥০ আটআনা।

বাঙ্গালীর নির্ব্বাসন যেমন নূতন ব্যাপার, “নির্ব্বাসন-কাহিনী” ও বাঙ্গালা সাহিত্যে নূতন বস্তু। সাহিত্যের হিসাবেও এই গ্রন্থ উপাদেয়, ঘটনার বিশেষত্বের ত কথাই নাই।

"বঙ্গবাসী"—এই 'নির্ব্বাসন-কাহিনী' উপন্যাসবিজয়িনী।

"নব্যভারত"—এই কাহিনী উপন্যাসের ন্যায় মনোরম, পড়িতে পড়িতে বিহ্বল হইয়া পড়িতে হয়। * * বাঙ্গালা ভাষা উপকৃত হইল।"

শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় (নায়কে) - —"পড়িতে পড়িতে যেন আত্মহারা হইতে হয়। ইহাতে ভাব গাম্ভীর্য্য, বিশ্লেষণ পারিপাট্য, বর্ণ-বৈচিত্র আছে। ভাবুকের ভাবোচ্ছাস, আস্তিকের ঈশ্বর-নির্ভরতা, এ পুস্তকের ছত্রে ছত্রে পত্রে পত্রে পাওয়া যায়। * * * রাজভক্ত হও, দেশভক্ত হও, যিনি যেমনই হওনা কেন এই পুস্তক সকলেরই পাঠ্য হওয়া উচিত। ইহা বঙ্গীয় ভাবুকের বৈজয়ন্ত স্বরূপ। এ পুস্তক বাঙ্গালী পাঠ কর, তোমার জীবন সার্থক হইবে।"

"আনন্দবাজার-পত্রিকা"—গ্রন্থখানি পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ পর্য্যন্ত না পড়িয়া থাকা যায় না। গ্রন্থের ভাষা ও ঘটনা সর্ব্বত্রই চিত্তাকর্ষী।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত বেদান্তরত্ন—"নির্ব্বাসন-কাহিনী" পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিয়াছি। সরল ভাষায় আন্তরিক ভাবে আপনি নির্ব্বাসন কালের ঘটনাগুলি এমনভাবে সজ্জিত করিয়াছেন যে, আদ্যোপান্ত আগ্রহের সহিত পাঠ করিতে হয়। বিড়ালী আহুরীর কাহিনীটী বেশ চিত্তাকর্ষক।"

Modern-Review—'This neatly printed little book is composed of extracts from the diary of one of the Bengal deportees. It is intensely interesting from start to finish. * * * * The writer's natural piety is evident in every page and there are both pathetic and humorous touches which at once place us on a footing of perfect intimacy with him'.

আশা-প্রদীপ।

মূল্য ॥৵০ দশ আনা।

এই খানিই বাংলা ভাষায় মুগ্ধকরণ (Mesmerism) ও প্রেততত্ত্ব (Spiritism) সম্বন্ধীয় মৌলিক ও সুপ্রতিষ্ঠিত গ্রন্থ। ইহাতে কল্পনা বা অনুবাদ নাই। স্বনাম ধন্য শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত এবং বরিশালের বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত লোকের সঙ্গে এই গ্রন্থের বিশেষ সংশ্রব আছে। এই পুস্তক পাঠে পরকালের আভাস ও শোকে শান্ত্বনা পাওয়া যায়।
